মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৬, সংখ্যা-০৪

মে ২০১৭ ইং, শা'বান ১৪৩৮ হি., জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বাং

شعبان ١٤٣٨ھ، مايو ٢٠١٧م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৯.... ৫
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৮
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
সফল পরীক্ষার্থী..... ৯
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
ব্রিটিশ শিক্ষা সিলেবাস : পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা..... ১১
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
শানে সাহাবা : ১৮
মুফতী আতীকুল্লাহ
জুমু'আর দিন ৮০ বার দরূদ পাঠের হাদীস ও কিছু কথা..... ২৯
মুফতী মাহমূদ হাসান
'তালাকে তাফইজ' (স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান)..... ৩৪
মুফতী শরীফুল আজম
ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-১১..... ৪০
মাওলানা কাসেম শরীফ
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৪

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

‘কওমী মাদ্রাসা থেকে শিক্ষার সূচনা’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “বাংলাদেশে (তথা উপমহাদেশে) শিক্ষার সূচনা হয়েছে কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে। এটা যদি শুরু না হতো, তাহলে আমরা কেউ শিক্ষিত হতে পারতাম না।” তিনি আরো বলেন, “ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন উলামায়ে কেরাম। এরপর তাঁরা দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তা থেকেই মূলত স্বাধীনতার সূত্রপাত।” “বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় কওমী মাদ্রাসাগুলোতে।”

গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ ইং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবনে আয়োজিত দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের এক ঐতিহাসিক বৈঠকে এসব কথা বলেন।

তিনি এই বৈঠকে কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্সের (ইসলামিক স্টাডিজ ও অ্যারাবিক) মানও ঘোষণা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব কথার মধ্য দিয়ে মূলত উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন এবং ইসলামী শিক্ষা বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাসের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যে ইতিহাস সম্পর্কে বর্তমানে অনেক আধুনিক শিক্ষিতরাও অবগত নন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, ব্রিটিশবিরোধী ওই আন্দোলন উপমহাদেশের স্বাধীনতা এবং পরবর্তী বাংলাদেশের স্বাধীনতারও মৌলভিত্তি। অর্থাৎ উলামায়ে কেরামের সূচনাকৃত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই মূলত ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে গেলে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ইসলামী শিক্ষার সূচনা হয় ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের পরপরই। কিন্তু সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এরও বেশ কিছুকাল পরে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ ঘোরি ১১৯১ সালে আজমিরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানি আমলে মসজিদকেন্দ্রিক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়।

মোগল আমলে ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এটা সর্বজনবিদিত যে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কখনো ধর্মবিবর্জিত ছিল না। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত UNESCO-i Studies on Compulsory Education-এ উল্লেখ করা হয়েছে : ‘মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা ও ধর্মকে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিবেচনা করা হতো।’ ভারতবর্ষে ‘দিল্লি সালতানাত’ স্থায়ী হয় প্রায় ৩২৫ বছর বা ৩২০ বছর। এ সময়ে ভারতে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগের একটি প্রধান দিক ছিল মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ। দিল্লিতে প্রথম মাদ্রাসা স্থাপিত হয় শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের আমলে (১২১১-১২৩৬)। সুলতানি আমল হয়ে মোগল আমলে আলেমসমাজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম শাসক, আমির-উমারা ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিলুপ্তি সাধন হলে ওই সব মাদ্রাসার আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এই জনপ্রিয় শিক্ষাধারা ধসে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের নানা রীতি, বিশেষত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ঘোষণায় উপমহাদেশের অগণিত মাদ্রাসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে। শিক্ষার এই পতনের পর মুসলমানদের পুনরুত্থানে অনেক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। নতুন করে মুসলমানদের শিক্ষা বিপ্লব শুরু হয় ১৮৬৬ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ভারত উপমহাদেশকে ইংরেজমুক্ত করা এবং শিক্ষার পুনরুত্থান উভয়টি একই ধারাবাহিকতায় উলামায়ে দেওবন্দের ত্যাগের বিনিময়ে হয়েছে।

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রযুদ্ধ পরিচালনা করেন নবাব সিরাজুদ্দৌলার নানা আলী ওয়ারদী খান ১৭৫৪ সালে। এরপর ক্ষমতায় আসেন তাঁর নাতি নবাব সিরাজুদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সরকার তাঁকে শহীদ করে। ১৭৯৯ সালে ইংরেজবিরোধী জিহাদে শাহ ফতেহ আলী সুলতান টিপুসহ বহু মুসলমান শহীদ হন। অতঃপর বিশ্ববরেণ্য মহামনীষী হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামষ্টিকভাবে জিহাদ পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করেন উলামায়ে কেরাম এবং দেশের জনগণকে। ১৮০৩ সালে তাঁরই সন্তান শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.) হিন্দুস্তানকে দারুল হারাব ফাতওয়া দেন। এই ফাতওয়ার ভিত্তিতে পুরো ভারত উপমহাদেশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহ.) এবং ইসমাঈল শহীদ (রহ.)সহ বহু মুজাহিদ বালাকোটে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। ১৮৫৭ সালে ঐতিহাসিক শামেলী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ৩৪ জন শীর্ষস্থানীয় আলেম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশদের প্রতিরোধের ডাক দেন। এই দলে সিপাহ সালারের ভূমিকায় ছিলেন হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.), হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.), হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)। হাজার হাজার উলামায়ে কেরামের শাহাদাত বরণ, কল্পনাতীত জুলুম-অত্যাচার, অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ ধূলিস্যাৎ করে ইসলামী শিক্ষাকে চিরতরে ধ্বংস করার ইংরেজ নীলনকশা বাস্তবায়ন ইত্যাদির কারণে একপর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যেই পতিত হয় পুরো ভারত উপমহাদেশে। পতন হতে থাকে পুরো শিক্ষাব্যবস্থারই। নেতৃস্থানীয় আলেমরা চিন্তা করলেন, শিক্ষার ভয়াবহ এই পতন অব্যাহত থাকলে স্বয়ং দেশ-জাতিরই অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার এবং পুরো জাতিসত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার

মানসে ১৮৬৬ সালের ৩০ মে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) ও হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর উপদেষ্টা ছিলেন। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর পর ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের হাল ধরেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)। ১৯১২ সালে তাঁর নেতৃত্বে রেশমি রুমাল আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ১৯১৭ সালে তাঁকে দেশান্তর করে নির্জন দ্বীপাঞ্চল মালটায় বন্দি রেখে নির্মম নির্যাতন করা হয়। এই বন্দি অবস্থায় তাঁর সাথে নিজেরই ছাত্র আওলাদে রাসূল (সা.) হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)ও ছিলেন। ১৯১৯ সালে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে একটি সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তাঁর পর এই আন্দোলন এবং দলের হাল ধরেছিলেন কুতবে আলম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। এই ধারাবাহিকতায় ভারত উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে ইংরেজমুক্ত হয়। বোঝা যায়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন করে তাদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেছেন কওমী উলামায়ে কেরাম তথা উলামায়ে দেওবন্দ। দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে হাজার হাজার আলেম শাহাদাত বরণ করেন।

১৮৬৬ সালে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম দেওবন্দই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন রূপ ও আঙ্গিকে প্রথম কওমী মাদ্রাসা। বলা যায়, শিক্ষার ব্যাপক পতনের পর দারুল উলূম দেওবন্দ ছিল নতুন করে শিক্ষা বিপ্লবের সূতিকাগার। এখান থেকেই উপমহাদেশে নতুন করে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার চর্চা শুরু হয়। অতঃপর দেওবন্দের কারিকুলামে দেশ-বিদেশে দ্বীনি মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার কওমী মাদ্রাসা।

ইংরেজ শাসনামলে এ দেশের সকল গণমানুষের দুর্দিনে উলামায়ে কেরামই সর্বপ্রথম জনগণকে সতর্ক করেন এবং নিজেরা রক্ত দিয়ে, জান দিয়ে অত্র অঞ্চলের সর্বধর্মীয় জনগণকে মুক্ত করেন। সঠিক দ্বীনি শিক্ষা সংরক্ষণে দেওবন্দী আদর্শের এক সুউচ্চ সৌধও রচনা করেন তাঁরা। এই ইতিহাস প্রমাণ করে উলামায়ে কেরাম কখনো কোনো সময় রাষ্ট্রবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী হতে পারেন না। কারণ তাঁদের দেশপ্রেম এবং দেশ-জাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। যা অবিস্মরণীয়, অনস্বীকার্য এক দীর্ঘ হৃদয়বিদারক ইতিহাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূলত এসব সঠিক এবং বাস্তব ইতিহাসের প্রতিই গণমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে। আমরা তাঁর আন্তরিক এবং সাহসী এই বক্তব্যের জন্য 'মোবারকবাদ' জানাই।

আমরা মনে করি, এসব বাস্তব ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে উলামায়ে কেরামের ত্যাগের ফসল কওমী মাদ্রাসা এবং পুরো দেশে ইসলামের সঠিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে মুসলমানদের আরো এগিয়ে আসতে হবে। সরকারেরও উচিত, এসব বিষয়ে উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা করা। আন্তরিকতার ওপর ভিত্তি করে উলামায়ে কেরামও যাবতীয় সঠিক দ্বীনি কর্মসূচিতে সরকারকে সহযোগিতা দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৩/০৪/২০১৭ ইং

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও
সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুত এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে থাকো। তাদের সংশোধন করতে থাকো এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। (আ'রাফ ১৪২)

এই আয়াতে হযরত মুসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের সেই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, যা ফেরাউনের জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের নিশ্চিন্ত হওয়ার সংঘটিত হয়েছিল। বলা হয়েছে, তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মুসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করেছিল যে এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এবার যদি আমাদের কোনো কিতাব এবং শরীয়ত দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সে মতে আমল করতে পারি। তখন হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন।

এতে واعدنا শব্দটি وعده (ওয়াদাহ) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে কাউকে লাভজনক কোনো কিছু দেওয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সে জন্য শর্ত আরোপ করেছে যে মুসা (আ.) ত্রিশ রাত তুর পর্বতে ই'তিকাফ ও আল্লাহর ইবাদত আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাতের ওপর আরো দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

واعـــدنـــا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দুই পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি; আর মুসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত যাবৎ ই'তিকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وعـــدنـــا না বলে واعدنا বলা হয়েছে।

এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথম চল্লিশ রাত ইতিকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কী? একত্রেই চল্লিশ রাতের ই'তিকাফের হুকুম দিয়ে দিয়ে দিলে কী ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হিকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোনো কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে প্রথমেই তার ওপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়। বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তাফসীরে কুরতুবীতে আরো বলা হয়েছে যে এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজের বা বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরো সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন–মুসা (আ.)-এর সাথে হয়েছে। ত্রিশ রাত যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি তখন অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এই দশ রাত বৃদ্ধির ব্যাপারে তাফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে ত্রিশ রাতের ই'তিকাফের সময় হযরত মুসা (আ.) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তুর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে রোযাদারের মুখে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয় তা আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরো দশটি রোযা রাখুন, যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে হযরত মুসা (আ.) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধদিনের ক্ষুধার্তেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজে ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন,

آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا

অর্থাৎ আমাদের নাশতা বের করো। কারণ এ ভ্রমণ আমাদের পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে তুর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোযা করা, যাতে রাতের বেলায়ও কোনো ইফতার করা যাবে না–বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে যে এই পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তুর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদিগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোনো কষ্টই তিনি অনুভব করেননি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ :

আয়াতটিতে আরো একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে নবী-রাসূলদের শরীয়তের তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, এই যে নবী-রাসূলদের শরীয়তে চান্দ্র মাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্র মাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সে জন্যই মাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানী যত ধর্ম রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্র মাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে,

حساب الشمس للمنافع وحساب القمر للمناسك

অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য, আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত উপাসনার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলকদ মাসের রাত্রি; আর এরই ওপর যিলহজ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে হযরত মুসা (আ.) তাওরাতের উপঢৌকন লাভ করেছিলেন কোরবানীর দিন। (কুরতুবী)

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমাতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেবেন। (রূহুল মাআনী)

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৯

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–প্রথম অধ্যায় :

নামাযসংক্রান্ত ৪০ হাদীস :

১০। যখন কোনো ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেন। যখন সে নামায হতে মনোযোগ সরিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও মনোযোগ সরিয়ে নেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، مَوْلَى بَنِى لَيْثٍ، يُحَدِّثُنَا فِى مَجْلِسِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ، انْصَرَفَ عَنْهُ

(নাসাঈ শরীফ ৩/৮ হা. ১১৯৫, মুসনাদে আহমদ ৫/১৭২ হা. ২১৫০৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/২৩৬ হা. ৮৬২, সুনানে দারেমী ১/৩৫২ হা. ১৩৯৫, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ২/২৮২ হা. ৩৫৩২)

হাদীসটির মান : হাসান

১১। যখন কোনো আসমানী বালা-মুসিবত নাযিল হয় তখন তা মসজিদ আবাদকারীদের থেকে সরে যায়।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :إِذَا عَاهَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أُنْزِلَتْ صُرِفَتْ عَنْ عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৮২ হা. ২৯৪৭, আল কামেল [ইবনে আদী] ৩/২৩৪ হা. ৭৪৫)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

১২। কোনো কারণে যদি মানুষ জাহান্নামে যায় তবে তার সিজদার জায়গাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ :أَنَّ النَّاسَ قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ تُضَارُّونَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟، قَالُوا :لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :فَهَلْ تُضَارُّونَ فِى الشَّمْسِ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟، قَالُوا :لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا أَوْ مُنَافِقُوهَا -شَكَّ إِبْرَاهِيمُ -، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ :أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ :هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِى صُورَتِهِ الَّتِى يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ :أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ :أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا

الـجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ :تَـمَنَّهْ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّـهَ لَيُـذَكِّرُهُ، يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ :اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ "،
(বুখারী শরীফ ৭/৫৩৯ হা. ৭৪৩৭, মুসলিম শরীফ ১/১৬৩ হা. ১৮২, সহীহে ইবনে হিব্বান ১৬/৪৫০ হা. ৭৪২৯, মুসনাদে আহমদ ২/২৯৩ হা. ৭৯২৭, মুসনাদে আবী আওয়ানা ১/১৩৯ হা. ৪১৯, সুনানে নাসাঈ ২/২২৯ হা. ১১৪১, মুসান্নাফে আব্দির রাযযাক ১১/৪০৭ হা. ২০৮৫)
হাদীসটির মান : সহীহ

১৩। আল্লাহ তা'আলা সিজদার জায়গাগুলোকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন।
পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

১৪। সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট ওই নামায, যা সময়মতো আদায় করা হয়।
حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الـوَلِيدُ بْنُ العَيْزَارِ :أَخْبَرَنِي قَالَ :سَـمِـعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ :حَدَّثَنَا صَاحِبُ -هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ -عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :سَـأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّـهِ؟ قَالَ :الـصَّلاَـةُ عَـلَـى وَقْتِهَا، قَالَ :ثُـمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :ثُـمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ قَالَ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
(বুখারী শরীফ হা. ৫২৭, ৫৯৭০, মুসলিম শরীফ হা. ৮৫, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ২/২১৫ হা. ৩১৬৫, শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ২/১৭৫ হা. ৭৮২৫, সহীহে ইবনে হিব্বান ৪/৩৪০ হা. ১৪৭৭, নাসাঈ শরীফ ১/২৯২ হা. ৬০৯)
হাদীসটির মান : সহীহ

১৫। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সকল অবস্থার মধ্যে এই অবস্থায় দেখতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, যে মানুষ সিজদায় পড়ে রয়েছে এবং কপাল মাটিতে ঘষতেছে।
حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ الدَّارِعُ قَالَ :نا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ :نـا أَبِي الْهَيْثَمُ بْنُ جَهْمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَـا مِـنْ حَـالٍ يَـكُونُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يَرَاهُ سَاجِدًا مُعَفِّرًا وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ

الـرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ :الـلَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْـلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُم السَّعْدَانَ؟ "، قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ " :فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَـعْـلَـمُ مَـا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَـمِـنْهُـمُ الـمُـوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ -أَوِ الـمُـوثَـقُ بِعَمَلِهِ -، وَمِنْهُمُ الـمُـخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ الـلَّـهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَـرَ السُّـجُـودِ، حَـرَّمَ الـلَّـهُ عَـلَى النَّـارِ أَنْ تَـأْكُلَ أَثَرَ السُّـجُـودِ، فَيَـخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَـاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُـمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِـوَجْهِـهِ عَـلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ اصْـرِفْ وَجْهِـي عَـنِ الـنَّـارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْـرَقَـنِـي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ :هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ : لاَ، وَعِـزَّتِكَ لاَ أَسْـأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَـا شَـاءَ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَـا سَـكَـتَ مَـا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيْ رَبِّ، قَـدِّمْـنِـي إِلَـى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ :أَلَسْـتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُـودَكَ وَمَـوَاثِيـقَكَ أَنْ لاَ تَسْـأَلَـنِـي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا؟ وَيْـلَكَ يَـا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ :أَيْ رَبِّ، وَيَـدْعُو اللَّهَ، حَتَّـى يَقُولَ :هَـلْ عَسَيْـتَ إِنْ أُعْـطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ :لاَ وَعِـزَّتِكَ، لاَ أَسْـأَلُكَ غَيْـرَهُ، وَيُـعْـطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُـودٍ وَمَـوَاثِيـقَ، فَيُـقَـدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الـجَنَّةِ، انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِي الـجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ :أَلَسْـتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْـأَلَ غَيْـرَ مَـا أُعْـطِيتَ؟ فَيَقُولُ :وَيْـلَكَ يَـا ابْـنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ :أَيْ رَبِّ، لاَ أَكُـونَـنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ، قَالَ لَهُ :ادْخُلِ

(আল মুজামুল আওসাত [ত্বাবরানী] ৬/২২৮ হা. ৬০৭৫, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩০১ হা. ১৬৭১, তারগীব তারহীব [মুনযারী] হা. ৫৫৪, জামেউস সাগীর [সুয়ূতী] হা. ৮০২৩, কানযুল উম্মাল হা. ১৮৯২৮)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

১৬। সিজদার অবস্থায় মানুষ আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

(মুসলিম শরীফ ১/৩৫০ হা. ২১৫, নাসাঈ শরীফ ২/২২৬ হা. ১১৩৭, আবু দাউদ শরীফ ২/১৫৫ হা. ৮৭৫ , মুসনাদে আহমদ ১৫/২৭৪ হা. ৯৪৬১, আসসুনানুল কুবরা [বায়হাকী] ২/১১০ হা. ২৬৮৬, তাহাবী শরীফ ১/২৩৪, শরহুস সুন্নাহ [বাগাবী] ৩/১৫১ হা. ৫৫৮)
হাদীসটির মান : সহীহ

১৭। নামায বেহেশতের চাবি।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

(তিরমিযী শরীফ ১/১০ হা. ৪, মুসনাদে আহমদ ২৩/২৯ হা. ১৪৬৬২, সুনানে কুবরা [বায়হাকী] ৩/৪ হা. ২১৭২, আল মুজামুল আওসাত ৪/৩৩৬ হা.৪৩৬৪)
হাদীসটির মান : সহীহ লিগাইরিহী

১৮। মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা ও নামাযী ব্যক্তির মধ্য হতে পর্দাসমূহ সরে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাশি ইত্যাদির মধ্যে মশগুল না হয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَذُوعِيُّ الْقَاضِي، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا طَرِيفُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو غَالِبٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَكُشِفَتْ لَهُ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاسْتَقْبَلَتْهُ الْحُورُ الْعِينُ، مَا لَمْ يَمْتَخِطْ أَوْ يَتَنَخَّعْ

(আল মুজামুল কাবীর [ত্বাবরানী] ৮/২৯৯ হা. ৭৯৮০)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

১৯। নামাযী ব্যক্তি শাহেনশাহের দরজায় খটখটাতে থাকে, আর স্বাভাবিক নিয়ম হলো দরজা খটখটাতে থাকলে তা খুলে যায়।

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ " :مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ يَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/১৪৬ হা. ৩১৪৮)
হাদীসটির মান : সহীহ

২০। দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشِّيرَازِيُّ قَالَ :نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَبَرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ :نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

(আল মুজামুল আওসাত [তাবরানী] ২/৫৪ হা. ৩১৩, আল মুজামুস সাগীর [তাবরানী] ১/৬০, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/২৯২ হা. ১৬১৪, জামেউস সাগীর [সুয়ূতী] ৪/১৯৩৯ হা. ৯৭০৫)
হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

উদ্দেশ্য হলো যিকির, বিভিন্ন রূপ গ্রহণ উদ্দেশ্য নয় :

আল্লাহ তা'আলার যিকির উদ্দিষ্ট বিষয়। বিভিন্ন প্রকার রূপ গ্রহণ, অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন–তালেবে ইলমদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নম্বর ভালো আসা উদ্দেশ্য, পুরস্কার পাওয়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন দুজন তালেবে ইলম। একজন ভালো নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাকে কারো পক্ষ থেকে মিষ্টি খাওয়ানো বা পুরস্কৃত করা হয়নি। যার কারণে সে পেরেশান হয়ে অন্যের কাছে অভিযোগ করতে থাকল যে এত নম্বর পেয়ে আমি পরীক্ষায় পাস করেছি। কিন্তু কেউ তো আমাকে মিষ্টিও খাওয়াল না, পুরস্কারও দিল না। মানুষ তাকে কী বলবে? বলবে, ভাই আসলে তো উদ্দেশ্য ছিল বেশি নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। সেভাবে তো তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। সফলতার মুখ দেখতে পেয়েছ। এর ওপরই তোমার ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। সেটাই তুমি অর্জন করে ফেলেছ। মিষ্টি ইত্যাদি তো বাহ্যিক বিষয়। প্রাসঙ্গিক বস্তু। এর ওপর তোমার সফলতা ও ক্রমবিকাশ নির্ভর করে না। এর জন্য তোমার পেরেশান হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। আরেকজন তালেবে ইলম পাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নম্বর খুব কম পেয়েছে। তাকে উৎসাহিত করার জন্য কেউ মিষ্টিমুখ করাল, আর কেউ কিছু টাকা-পয়সা দিল। যার কারণে সে যদি উতাল-পাথাল শুরু করে যে আমি পরীক্ষায় পাস করে এত টাকা পেয়েছি, এতগুলো পুরস্কার অর্জন করেছি। এরূপ ছাত্রকে লোকেরা কী বলবে? বলবে, তুমি আসলে বেকুব-কাণ্ডজ্ঞানহীন। তুমি এসব দিয়ে কী করবে। আসল জিনিস তো পাওনি। অর্থাৎ নম্বরে ভালো করোনি। যার মাধ্যমে তোমার সম্ভাবনাময় জীবনে আরো উন্নতি করতে পারতে। সেটা তো তুমি পাওনি। তুমি তো চাইলে আরো ভালো নম্বর নিয়ে পাস করতে পারতে। সেটা তো তুমি পারোনি। সামনের অনেক সম্ভাবনাকে তুমি হারিয়ে বসেছ। আর সামান্য মিষ্টিমুখ আর কয়েকটা টাকা-পয়সার ওপর তুমি যেভাবে আত্মতুষ্টিতে ফেঁপে উঠেছ মনে হয় তুমি আসলে আস্ত বেকুব। ভালো পাস করে যদি এসব না পেতে তোমার জন্য খুব ভালো ছিল।

যিকিরকারীকে সেভাবেই মনে করতে হবে। যিকিরকেই আসল উদ্দেশ্য-মাকসাদ এবং সফলতার মূল চাবিকাঠি মনে করে সারা জীবন যিকিরে লেগে থাকতে হবে। যিকিরের কারণে কোনো অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে কি না, কোন রূপে যিকির করব ইত্যাদির চিন্তা করা উচিত নয়। যিকিরকারীকে এরকম হতে হবে; যেমন কবি বলছেন–

یا بم اورا یا نہ یا بم جستجوئی می کنم
حاصل آید یا نہ آید آرزوئے می کنم

তাকে পাই না পাই, খুঁজতেই থাকব। অর্জিত হোক না হোক, আশা করেই যাব।

আসল বিষয় হলো তাআল্লুক মাআল্লাহ–আল্লাহর সাথে সম্পর্ক :

তরীকতের আসল বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক করা। এর জন্যই মূলত সব কিছু করা এবং করানো হয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ককে সহীহ এবং সঠিক রূপে করার জন্য শায়খে কামেল তথা কামেল পীরের সাথে সম্পর্ক জরুরি। নিজের অবস্থার অবগত করানো, শায়খের নির্দেশনা মতে চলা এবং এর ওপর আমল করা সবই এ জন্য হয়ে থাকে। শায়খের দিকনির্দেশনার ওপর আমল করতে করতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক হয়ে যায়।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কে পরিচয় :

তাআল্লুক মাআল্লাহ অর্জিত হওয়ার লক্ষণ এবং পরিচয় হলো, সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে যাওয়া। কোনো কাজে গাফলাত না আসা বরং প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে হাজের-নাযের জেনে করা। প্রত্যেক আমলে আল্লাহ তা'আলাকে হাজের-নাযের জেনে করার অভ্যাস সৃষ্টি হওয়াটা তরীকতের প্রারম্ভিক স্তর। এর ধারাবাহিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা এবং এর ওপর অবিচলতার মাধ্যমে ফাহমে সলীম–সঠিক বুঝ সৃষ্টি হবে। অতঃপর খওফ তথা খোদাভীতির বিভিন্ন স্তর পার করে তাআল্লুক মাআল্লাহ তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রগাঢ় হবে। এর পরেই সমস্ত আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি মতেই হতে থাকে। এই অবস্থাকে এভাবে বলা যায়–

سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہئے
مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہئے
اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہئے، کیا کیا نہ چاہئے

তাবৎ দুনিয়া বিদ্রোহী হবে কোনো পরোয়া নেই। চাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু তো আল্লাহর সন্তুষ্টিই। এখন এই দৃষ্টি বিবেচনায় নিজেই সিদ্ধান্ত নাও। তোমাকে কোন কাজ করতে হবে আর কোনটি ছাড়তে হবে।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

সফল পরীক্ষার্থী

نحمده ونصلى على رسوله الكريم اما بعد: فقد قال الله تعالى: واذكر فان الذكرىٰ تنفع المؤمنين۔

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা দিয়ে। কিন্তু কিছু মানুষ তা গ্রহণ করে না প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে। তবে সকলেই নিশ্চিতভাবে উপদেশদাতাকে সত্য ও সঠিক মনে করে। যেমন–রাসূল (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন তখন মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টানদের অনেকেই তা গ্রহণ করত না, কিন্তু সবাই রাসূল (সা.)-কে সত্য ও সঠিক মনে করত। গ্রহণ না করার কারণ ছিল তাদের অহংকার, প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকা। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের ভেতরের দিকটি কোরআনে তুলে ধরেছেন। ইরশাদ করেন–

يعرفونه كما يعرفون ابناء كم

'তারা তাঁকে (নবীকে) তাদের সন্তানদের চেয়েও ভালো চেনে।'

যারা বুদ্ধিমান, সমঝদার, দূরদর্শী তারা উপদেশ শুনে মানে এবং উপদেশ থেকে ফায়দা লুফে নেয়। উপদেশদাতা যে-ই হোক না কেন, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। আর নির্বোধ-অহংকারীরা উপদেশ পছন্দ করে না। উপদেশদাতাকে শত্রু ভাবে। আল্লাহ তা'আলা নসীহত-উপদেশ দেওয়াকে পছন্দ করেন। তাই তো পবিত্র কোরআনে হযরত লোকমান (আ.)-এর উপদেশবাণীগুলো উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তাঁর ছেলেকে করেছিলেন। এর থেকে বোঝা গেল, বড়রা ছোটদের উপদেশ দেবে, পিতা-মাতা সন্তানকে উপদেশ দেবে। উস্তাদ ছাত্রকে উপদেশ দেবে। স্বামী তার স্ত্রীকে উপদেশ দেবে। আলেম জাহেলকে উপদেশ দেবে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীকে উপদেশদাতা হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই যারা নবীগণের ওয়ারিছ তারা নিজেরা সৎকাজ করবে এবং অন্যদেরকে সৎকাজের উপদেশ দেবে–এটাই স্বাভাবিক। নিজেরা জালিয়াতি থেকে মুক্ত থাকবে, অন্যদেরও জালিয়াতি থেকে বেঁচে থাকতে উপদেশ দেবে ও উৎসাহিত করবে।

পরীক্ষা দেওয়া-নেওয়া শরীয়তবিরোধী নয়। কারণ রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে পরীক্ষা নিয়েছেন। তবে পরীক্ষা দিতে গিয়ে জালিয়াতি করা অবশ্যই শরীয়তবিরোধী, খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত কবীরা গোনাহ। শুধু লেখাপড়া করলেই হবে না, আমানতদারীও শিখতে হবে। পরীক্ষা শুধু পরীক্ষা হিসেবে দিলে কোনো লাভ নেই। পরীক্ষা দিতে হবে সুন্নাত ও ইবাদত মনে করে। ইবাদতে সাওয়াব পাওয়ার জন্য ইখলাছ জরুরি। ইখলাছ ছাড়া যেকোনো কাজ আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। ইখলাছপূর্ণ পরীক্ষার স্বীকৃতি আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে, দুনিয়াতে মানুষ তার স্বীকৃতি দিক বা না দিক। আর ইখলাছবিহীন পরীক্ষার স্বীকৃতি দুনিয়াতে পাওয়া গেলেও আখেরাতে আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। বরং জবাবদিহি করতে হবে, আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ইলম-জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য শেখা উচিত, যদি কোনো ব্যক্তি ইলম ধন-সম্পদ ও সম্মান লাভের আশায় শেখে তাহলে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (আবু দাউদ)

যে ইলম জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াবে, সে ইলম কোনো উপকারী ইলম হতে পারে না, এটা একজন নির্বোধও স্বীকার করবে। তাই তো রাসূল (সা.) এ ধরনের অপকারী ইলম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন–

اعوذ بالله من علم لا ينفع و قلب لا يخشع

যে ইলম উপকারী নয় এবং যে কলবে আল্লাহর ভয় নেই, সেই ইলম ও কলব থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন–

من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار

যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে শিখবে তার ঠিকানা জাহান্নাম। (তিরমিযী)

রাসূল (সা.) আরো ইরশাদ করেন–

من جعل الهموم همما واحداهم اخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم فى احوال الدنيا لم يبال الله فى اى اوديتها هلك۔

'যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আখেরাত-দ্বীন হবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়ার যাবতীয় জরুরত পুরা করে দেবেন। আর যার উদ্দেশ্য দ্বীন নয় বরং দুনিয়ার বিক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য হবে, সে কোথায় ধ্বংস হবে আল্লাহ তা'আলা এর কোনো পরোয়া করেন না। (ইবনে মাজাহ, শু'আবুল ঈমান)

এই হাদীসের শেষাংশের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন–

لايكفيه هم دنياه ولا هم اخراه فيكون ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔

যার লক্ষ্য দুনিয়ার বিক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যে হবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ করবেন না। এভাবেই সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মিরকাত)

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা গেল ইলমে দ্বীন তলবে যার মধ্যে ইখলাছ থাকবে না সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এবার নিজেরাই ঠিক করতে হবে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যাদের সাথে আছেন তাদের নাকি যাদের সাথে আল্লাহ নেই তাদের? যারা দুনিয়ায় স্বীকৃতি চায় পরীক্ষায় তারা যেকোনোভাবে পাস করতে চায়, নকল করে, জালিয়াতি করে, দুর্নীতি করে, সন্ত্রাসী কায়দায়। এটাকে তারা সফলতা ভাবে, মূলত এটা মূর্খতা। আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তারা দুনিয়ার সামনে অকৃতকার্য অস্বীকৃত হলেও খেয়ানত না করতে বদ্ধপরিকর। কারণ অকৃতকার্য হলেও সে সফল। যেহেতু সে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে ধন্য, বেহেশত হবে তার ঠিকানা। আর জালিয়াতি করে সফলতা লাভকারীদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমানতদারী রক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

AL MARWAH OVERSEAS
recruting agent licence no-rl156
ROYAL AIR SERVICE SYSTEM
hajj, umrah, IATA approved travel agent
হজ, ওমরাসহ বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং ও সকল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে অল্পখরচে দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।
Shama Complex (6th Floor)
66/A Naya Paltan, V.I.P Road
(Opposite of Paltan Thana East Side of City Haeart Market)
Dhaka: 1000, Bangladesh.
Phone: 9361777, 9333654, 8350814
Fax 88-02-9338465
Cell: 01711-520547
E-mail: rass@dhaka.net

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

ব্রিটিশ শিক্ষা সিলেবাস : পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

(১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং রোজ শুক্রবার, গুলশানে আবরার, রহমানিয়ার, মোহাম্মদপুরস্থ জামিআতুল আবরার মসজিদ ভবন 'মসজিদুল আবরারে' মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ইমামদের মাসিক সম্মেলনে প্রদত্ত বয়ান।)

হামদ ও সালাতের পর.....

কোরআনে পাকে সূরা নিসার ৮০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করল, প্রকারান্তরে সে আল্লাহকে অনুসরণ করল।" অর্থাৎ আমাদের রাসূল এমন এক সত্তা যে, তাঁর অনুসরণ, আল্লাহরই অনুসরণ।

আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর সূত্রে এসেছে। তিনি বলেন, আমি নবীজির যবান থেকে যা-ই শুনতাম, মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে সব লিখে নিতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে এ বলে বাধা প্রদান করল যে তুমি নবীজির সব কথাই লিপিবদ্ধ করো, অথচ নবীজি তো একজন মানুষ বৈ কিছু নন। আলাপচারিতায় তিনি কখনো ক্রোধান্বিত হন, আবার কখনো ক্রোধমুক্তও থাকেন! কুরাইশদের এ কথা শুনে আমি নবীজির সব কথা লেখা হতে নিবৃত্ত হলাম এবং বিষয়টি নবীজি (সা.)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। নবীজি তা শুনে নিজ যবানের দিকে ইশারা করে বললেন,

اُكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ

"তুমি আমার থেকে যা শোনো, সব কিছুই লিখে রাখো। কেননা ওই পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার এ যবান হতে সত্য ব্যতীত কিছু বের হয় না!" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৬৪৬)

মানব জাতির হিদায়াতের পথ অনুসরণের জন্য আল্লাহ পাক অনেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে এবং তাদের অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেক মুসলমানও আজ নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণ করে ঈমানহারা হয়ে যাচ্ছে। জনৈক চিন্তাবিদ তো আম্বিয়া (আ.)-এর ওপর দোষারোপ করে লিখেছে, "শুধু আমাদের নবী নয়, অন্যান্য নবীর দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা কয়েকটা কবীরা গোনাহ করিয়েছেন।" (নাউযুবিল্লাহি)

মনে রাখতে হবে, নবীদের দোষচর্চা করা, সাহাবীদের দোষচর্চা করা গোনাহে কবীরা, লা'নত এবং গজবের কারণ।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের নবীজি প্রত্যহ ১০০ বার ইস্তেগফার করতেন। কিন্তু নবীজির এই প্রত্যহ ১০০ বার ইস্তেগফার গোনাহের কারণে ছিল না; বরং এর কারণ ছিল যে নবীজি (সা.)-এর দরবারে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যাতায়াত ছিল। নবীজি (সা.)-এর তাসীর তথা সাহচর্যের প্রভাব তাদের ওপর পড়ত, তাদেরও কিছু কিছু তাসীর নবীজির ওপর পড়ত। তখন নবীজি দিলের মধ্যে এক প্রকার অন্ধকার মতো অনুভব করতেন। সে অন্ধকার দূর করার জন্যই দৈনিক ১০০ বার ইস্তেগফার করতেন। এ জন্য দাওয়াতের সাথে সাথে ইস্তেগফারও জারি রাখতে হবে। অন্যথায় মাখলুকের বদ তাসীরে এক সময় দিলও শক্ত হয়ে যাবে, আমলও ছুটে যাবে। কোনো ব্যক্তি যদি সারা দিন খায়, মেসওয়াক না করে তাহলে তার দাঁতে ময়লা জমে একপর্যায়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ মাখলুকের সোহবতে গোনাহের কারণে নেককারের দিলের মধ্যেও ময়লা জমে। আর সে ময়লা দূর হয় ইস্তেগফার দ্বারা।

যাহোক, সূরা নিসার ৮০ নং আয়াতে নবীজি (সা.)-এর অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলা হয়েছে। সূরা শু'আরাতেও অনেক নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক নবী দুনিয়াতে এসে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন–

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য আমানতদার রাসূল (উম্মতের বহুত বড় আমানত নবীগণের ওপর)। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো। (সূরা শু'আরা; ১০৭-১০৮)

আমাদের কাজ নবীজি (সা.)-এর অনুসরণ করা :

আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নবীজিকে নমুনা বানিয়েছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ 'আমার রাসূল (সা.)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে।' আমাদের দায়িত্ব হলো রাসূলের অনুসরণ শেখা এবং আমল করা। শুধু নামাযের মধ্যে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে। গোঁফ কেমন হবে? দাড়ি কী পরিমাণ লম্বা রাখতে হবে? বগলের নিচের পশম, নাভির নিচের লোম কত দিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে? পুরুষদের পাজামা, লুঙ্গি টাখনুর নিচে থাকবে না ওপরে থাকবে? মুসলমানেরা কীভাবে থাকবে, কীভাবে খাবে?

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কোরআনে কারীমের এ আদেশ যথাযথ পালন করেছেন। পূর্ণাঙ্গরূপে নবীজির অনুসরণ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য রাসূলের (সা.) সব কিছু আমল করে দেখিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের জিন্দেগী তালাশ করলে নবীজির অনুসরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের লেবাস-পোশাক, চেহারা-সুরত অন্য জাতির মতো। অথচ নবীজি (সা.) ইরশাদ করেছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم

যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, হাশরের ময়দানে সে তাদের সাথে থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ৫১১৫)

আরেক হাদীসে নবীজি (সা.) উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন–

لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله : اليهود، والنصارى قال :فمن

যার সারকথা হলো, আমার উম্মতের ওপর এমন এক যমানা আসবে, যখন তাদের চাল-চলন ইহুদি-খ্রিস্টান কাফেরদের ন্যায় হবে। বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে মেপে মেপে তারা ইহুদি-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে। (বুখারী, হাদীস নং-৩৪৫৬)

কাফের-বিজাতীয়দের এ অনুকরণ ও অনুসরণের নেপথ্য কারণ হলো, মুসলমানদের মনস্তাত্ত্বিক পরাধীনতা, যা সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ শিক্ষা সিলেবাসের কারণে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেদের সাংস্কৃতিক দাস তৈরির উদ্দেশ্যে খ্রিস্টানরা সারা দুনিয়াতে তাদের শিক্ষা সিলেবাস চালু করেছে। ২০০ বছরের শাসনের পর উপমহাদেশের ভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময়ও ব্রিটিশরা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বাস্তবায়ন করে গেছে। তাদেরই রচিত শিক্ষা সিলেবাস আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হচ্ছে। আমাদের সন্তানরা এই সিলেবাসের বিষক্রিয়ায় নবীজি (সা.)-এর আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। কখনো খ্রিস্টানদের চাল-চলন, কখনো খেলোয়াড়দের চাল-চলন, কখনো সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের চাল-চলন গ্রহণ করে। সন্তানকে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করায়। অথচ কোনো মুসলমান তার সন্তানকে খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করার অর্থ হলো, গার্জিয়ান কর্তৃক স্যারকে এ কথা বলে দেওয়া যে, "স্যার! আপনি যেমন বেঈমান হয়েছেন, আমার সন্তানটাকেও আপনার মতো পাক্কা বেঈমান বানিয়ে দেবেন।" অথচ আল্লাহ তা'আলা কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেন–

كنتم خير أمة اخرجت للناس

হে মুসলমানের সন্তানগণ! তোমরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর মঙ্গলের জন্য পাঠিয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান, ১১০)

তোমরাই দুনিয়াবাসীকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবে, দোজখ থেকে বাঁচাবে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছেন দুনিয়াতে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমাদের সন্তানরা ব্রিটিশ সিলেবাসের প্রভাবে খ্রিস্টানদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি, সভ্য জাতি ভাবছে। আমরা সন্তানদেরকে কোরআনের এ সকল আয়াত শিখাইনি, তাদের এ কথা বুঝাইনি যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের ন্যায় আমাদেরকেও বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন, আমরা কোনো জাতির গোলাম নই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ। নবীজি (সা.) আমাদের কোনো বিষয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের মুখাপেক্ষী করে যাননি। তারা তো ফরয গোসল পর্যন্ত জানে না, হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মীয় কিতাবও বিকৃত করে, শূকর-কুকুরকে হালাল মনে করে।

নবীজির অনুসরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে খাদ্য ও আহার গ্রহণ করার মাঝে। কিন্তু এখানে আজ নবীজির

অনুসরণ আমাদের মাঝে চরমভাবে উপেক্ষিত।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "খাওয়ার সময় উভয় হাত কবজিসহ ধুয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার দিক থেকে শুরু করু।' (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৫২১২)

হাদীসের শব্দ كل مما يليك তোমার দিক থেকে খাও। "তোমার দিক" এ কথার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে, এক প্লেটে কমপক্ষে দুজন হতে হবে। কেননা একজন বসলে পুরোটাই তার দিক, আরেকজন হলে "তোমার দিক" বলা যাবে। কেননা তখন প্রত্যেকের "দিক" থাকবে। কিন্তু বাঙালি পূর্বপুরুষগণের জীবন-চরিতে হিন্দুত্বের প্রভাব ছিল বেশি। তখন নামের সাথে "শ্রী" লেখা হতো। একটু পুরনো দলিলপত্র দেখলে এখনও নামের শুরুতে "শ্রী" পাওয়া যায়। কিছু আল্লাহর বান্দা নামের শুরুতে "মুহাম্মাদ" লাগিয়ে "শ্রী" লেখার প্রথা বন্ধ করে দিয়েছেন। পূর্বপুরুষগণের কারণে হিন্দুয়ানি স্বভাব-সংস্কৃতি এখনো বাঙালি সমাজে রয়ে গেছে। যেমন হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতার অপসংস্কৃতির একটি প্রতিক্রিয়া হলো পরিবারের প্রত্যেকের প্লেট, গ্লাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। একজনের জিনিস আরেকজন ব্যবহার করা হিন্দু ধর্মে কবীরা গোনাহের মতো অপরাধ। ধুতি পরিধান করা, কাঁকড়া খাওয়া, মৃত্যুর ৪০ দিন পর কুলখানি করা ইত্যাদি অযৌক্তিক আনুষ্ঠানিকতাও হিন্দু ধর্ম থেকে এসেছে। হিন্দুরা মৃত্যুর ৪০ দিন পর "শ্রাদ্ধ" খাওয়ায়। মুসলমানদের মাঝে কুলখানির প্রথা হিন্দুদের শ্রাদ্ধ খাওয়ানোর প্রথা থেকে উদ্ভূত। এসব প্রথা মুসলমানদের মধ্যে থাকা বড় দুঃখজনক। মুসলমানদের জন্য তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি দাখেল হও। (সূরা বাকারা, ২০৮)

আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ভাই, যাদের দাওয়াত ও তাবলীগ কিংবা উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে কোনো দ্বীনি মেহনতের সাথে সম্পর্ক নেই, উলামায়ে কেরামের মজলিসে আসা-যাওয়া নেই, দ্বীনি কোনো সোহবত পায়নি, খ্রিস্টানদের সাথে তারাও শূকর-কুকুর খায়, মদ পান করে। অথচ ইসলামে শূকর খাওয়া আর তাজা পায়খানা খাওয়া, মদ পান করা আর তাজা প্রস্রাব পান করা একই কথা, কোনো পার্থক্য নেই। এভাবে নবীজি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "তোমরা বিঘতে বিঘতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করবে" তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উলামায়ে কেরাম ইংরেজি শেখাকে হারাম বলেন না; বরং ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজ হয়ে যাওয়াকে নিষেধ করেন। তাঁরা ইংরেজি শিখতে বলেন দাওয়াতের নিয়্যাতে, হালাল চাকরির নিয়্যাতে। এতে আল্লাহ তা'আলা সওয়াব দান করবেন। ইংরেজি শিখতে গিয়ে ইংরেজ হওয়া যাবে না, তাদের চাল-চলন গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু কথায় আছে, "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় হনুমান।" যেই ইংরেজি শিখতে যায় সেই ইংরেজ হয়ে যায়।

প্রাইমারিতে সম্পূর্ণ মারে না, 'প্রায় মারে' অর্থাৎ অর্ধেক মারে। প্রাইমারিতে পড়া অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করত, টাখনুর ওপর কাপড় পরত, মুরব্বিদের শ্রদ্ধা করত, বসে প্রস্রাব করত। কিন্তু যত ওপরে ওঠে, নামায ছাড়তে থাকে। টাখনুর নিচে কাপড় পরতে শুরু করে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে শেখে। মুরব্বিদের সালাম দেওয়া বন্ধ করে দেয়। দাড়ি কেটে ঈমানের আলামত নষ্ট করতে থাকে। বাম হাত দিয়ে খায়। অথচ নবীজি (সা.) কঠোরভাবে বাম হাত দিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন যে, "বাম হাত দিয়ে খেয়ো না। কেননা বাম হাত দিয়ে শয়তান খায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৬৮)

বাহ্যিকভাবে শয়তানের অনুসরণ করলে, কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করলে ভেতরটাও তাদের মতো হয়ে যায়। বাম হাত দিয়ে খেলে, চায়ের কাপ বা গ্লাস বাম হাত দিয়ে ধরলে শয়তানের মতো অহংকার পয়দা হয়। শয়তান যেমন অহংকারের কারণে হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করতে পারেনি বাম হাত দিয়ে খেলে সেও আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের সামনে মাথানত করতে পারে না।

ব্রিটিশ সিলেবাসের বিষফলে আক্রান্ত হয়ে আজ আমরা দিবস পালন নামে কাফেরদের অনুসরণের আরো একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছি। ইসলামে দিবস পালন বলতে কোনো সংস্কৃতি নেই। আমরা ১২ই রবিউল আউয়াল পালন করি। জন্ম দিবস, মত্যু দিবস, বিবাহ দিবস, ভালোবাসা দিবস পালন করি। ওরশ করি। শবে বরাতসহ বিভিন্ন দিনে আলোকসজ্জা করি। এর কোনোটি হিন্দুদের জন্মাষ্টমী থেকে, কোনোটি খ্রিস্টানদের বড়দিন থেকে, আবার কোনোটি অগ্নিপূজকদের থেকে এসেছে। বিজাতীয় সংস্কৃতি দেখে দেখে আমরা ইসলামে ঢুকিয়েছি। খ্রিস্টানদের মতো চুল রাখছি। তাদের মতো চেহারা-সুরত বানাচ্ছি। টাই পরছি। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করছি। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারীর ওপর আল্লাহ

তা'আলা এমন নারাজ হন যে হাদীসে এসেছে, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে তাকাবেন না, তার গোনাহ মাফ করবেন না। (শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং-৫৭২৬)

বর্তমানে আমাদের দেশে "ভালোবাসা দিবস" পালিত হয়, যা সম্পূর্ণ খ্রিস্টানদের কালচার। ভালোবাসা তো পিতা-মাতা, সন্তানাদি এবং বিবির সাথে হবে। এসব ভালোবাসা শরীয়তসম্মত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "মুহাববত করে বিবির মুখে একটা লোকমা উঠিয়ে দিলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫৬)

ব্রিটিশ সিলেবাসের ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ইসলামের অন্যতম ফরয হুকুম পর্দার বিধান নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নারী সমাজের মাঝে পাশ্চাত্যের নষ্ট অনুকরণের মানসিকতা তৈরি হওয়া। দু-একটি উদাহরণ পেশ করছি। ইসলামে অধিক বয়স্কা মহিলাদের চেহারার পর্দার বিষয়টি কিছুটা শিথিল। হাদীসে পাওয়া যায়, অধিক বয়স্কা মহিলাদের সাথে হযরত আবু বকর (রা.) মুছাফাহা করতেন। (নাসবুর রায়াহ ৪/২৪০, দেরায়াহ ২/২২৫)

কিন্তু অধিক বয়স্কা বৃদ্ধার ক্ষেত্রেও চুলের পর্দার হুকুম মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ববত বহাল থাকে। খ্রিস্টানরা এনজিওদের মাধ্যমে প্রথমেই মহিলাদের মাথা অনাবৃত করে দিয়েছে। দোহাই দিচ্ছে, মাথায় কাপড় রাখলে মাথা গরম হয়ে যায়। ছেলেদের দিচ্ছে শক্ত মোটা টুপি (ক্যাপ) তাতে ছেলেদের মাথা গরম হয় না। অথচ মেয়েদের মাথায় ওড়না থাকলে নাকি মাথা গরম হয়ে যায়! মনে রাখতে হবে যে সব বয়সী নারীদের জন্যই চুল ঢেকে রাখা আবশ্যক। চুলের পর্দা বয়সের তারতম্যের কারণে কোনো অবস্থাতেই শিথিল হয় না। যদিও চেহারার পর্দার বিষয়টি একপর্যায়ে শিথিল হয়ে যায়। যেমন অধিক বৃদ্ধা নারীদের চেহারার পর্দার শিথিলতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে সকল বৃদ্ধা নারীদের বিবাহের কোনো আশা নেই, তাদের জন্য এতে কোনো গোনাহ নেই যে তারা নিজেদের (বাড়তি) কাপড় (বহির্বাস, গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে) খুলে রাখবে, সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা ব্যতিরেকে। আর যদি তারা সাবধানতা অবলম্বন করে (গাইরে মাহরামের সামনে বহির্বাসও গায়ে জড়িয়ে রাখে) তবে সেটাই তাদের পক্ষে শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলা সব কিছু শোনেন এবং সকল বিষয় জানেন। (সূরা নূর-৬০)

পাশ্চাত্যের শিক্ষা সিলেবাসের পাঠ গ্রহণ করে বিজাতীয়দের অনুকরণপ্রিয় হয়ে আমাদের সমাজব্যবস্থা কেবল পর্দা বিধানই উঠিয়ে দিচ্ছে না; বরং এ সমাজ এখন উন্মুক্ত মানসিকতার নামে বেহায়াপনার শিকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে বিবাহ একটি সামাজিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর বিপরীতে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। বহু বিবাহ তো তাদের কাছে রীতিমতো গর্হিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে বেগানা মহিলার সাথে ভালোবাসার সম্পর্কের কোনো অবকাশ নেই। কোনো মেয়ে কোনো ছেলের বান্ধবী হতে পারে না। বান্ধবী নামে কোনো আত্মীয় ইসলামে নেই। বেগানা মহিলার সাথে ভালোবাসা করা মানে তাকে যিনার পার্টনার বানানো। তাকে দেখা চোখের যিনা, স্পর্শ করা হাতের যিনা, তার দিকে হেঁটে যাওয়া পায়ের যিনা, তাকে নিয়ে কল্পনা-জল্পনা করা কলবের যিনা। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে একে অপরকে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বানায়, ফলে সার্বক্ষণিক যিনার মধ্যে লিপ্ত থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মেয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া একাকী গাইরে কুফুতে বিবাহ করলে বিবাহই সহীহ হয় না। কুফু হলো, দ্বীনদারীর, মালদারীর, বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদির দিক থেকে ছেলেমেয়ে সমান থাকা। কুফুর দিক থেকে সাধারণত মেয়ে ওপরে এবং ছেলে নিচে থাকে। ভালোবাসা করে কোর্টে গিয়ে বিবাহ করলে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। উপরন্তু কুফুর মিল না থাকায় এ ধরনের ১২ আনা বিবাহই শরীয়তসম্মত হয় না। কাজেই বিবাহপূর্ব ভালোবাসা সম্পূর্ণ হারাম।

আমাদের সমাজের অনেক মহিলার স্বামী মারা যায়, তালাকপ্রাপ্তা হয়, দ্বিতীয়বার বিয়ে বসে না। বিয়ের কথা বললে উত্তরে বলে, "বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়।" এটা কুফুরী কথা, যা পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। এ ধরনের কথা বললে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। শরীয়তে এ কথা নেই। শরীয়তের কথা কারো বুঝে না এলে সে পোড়া কপালি। কাজেই "বিয়ে জীবনে একবারই হয়" এ ধরনের কুফুরী কথা বললে পুনরায় তাকে কালেমা পড়ে ঈমান আনা উচিত। কোনো মহিলার ১০ বার বিবাহ ভেঙে গেলে ১১তম বারও তার বিয়ে বসার

অবকাশ ইসলামে রয়েছে।

আমাদের দেশে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করলে তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। অথচ যার জরুরত আছে, আর্থিক সামর্থ্য আছে, বাহ্যিক ইনসাফ তথা স্ত্রীদের মাঝে সমতা বজায় রাখতে পারে, তার জন্য একাধিক বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মতে জায়েয।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পছন্দমতো দুই-দুইটা, তিন-তিনটা, চার-চারটা বিবাহ করো। (সূরা নিসা, ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটা বিবাহের কথা উল্লেখই করেননি। বরং দুইটা থেকে চারটা পর্যন্ত বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ মহিলারা প্রত্যেক মাসে ৭-১০ দিন অপবিত্র থাকে। অনেক পুরুষ এই দীর্ঘ সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে না। তাদের জন্য ইনসাফ করার শর্তে একাধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দুজন বিবি ছিল। খানকায় একটি দাঁড়িপাল্লা রেখেছিলেন। বাজার থেকে দুটি তরমুজ আনলেও দুই ভাগ করে উভয় তরমুজের অংশ মিলিয়ে পাল্লা দিয়ে মেপে সমান করে দুই বিবির ঘরে পাঠাতেন। একটি তরমুজ এক ঘরে আরেকটি অন্য ঘরে পাঠাতেন না। কেননা হতে পারে একটা মিঠা, আরেকটা পানসে। কাজেই সর্বাবস্থায় একাধিক বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখা এবং একটি বিবাহের ওপর সন্তুষ্ট থাকার প্রবণতা খ্রিস্টানদের থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। খ্রিস্টধর্মে পত্নী হয় একজন, উপপত্নী হয় অনেকজন। অর্থাৎ তারা বলে "পত্নী তো একজনই হয়।" আর আমরা বলি, "বিবাহ তো জীবনে একবারই হয়।" কোনো বুজুর্গ যদি একাধিক বিবাহ করে তাহলে জনসাধারণের দৃষ্টিতে তার বুজুর্গি খতম হয়ে যায়। অথচ খ্রিস্টানদের কুপ্রথা ভাঙার কারণে এটা তার নাজাতের উসিলা হতে পারে।

খ্রিস্টানরা বিবাহ সম্পর্ক জটিল এবং সীমিত করে যিনা-ব্যভিচারের পথকে সুগম করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম দায়িত্বের সাথে বিবাহের পথকে নিষ্কণ্টক করে যিনার পথকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা আজ খ্রিস্টানদের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে সে যিনা-ব্যভিচারের পথেই সমাজকে নিয়ে যাচ্ছি।

আপন পুত্রের স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলেও পিতার জন্য চিরতরে হারাম। এমনিভাবে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলেও শাশুড়ি চিরতরে হারাম থাকে। অবশ্য পালক পিতার জন্য পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হালাল। কিন্তু আরব দেশে এটাকে নিন্দনীয় মনে করা হতো। আল্লাহ তা'আলা নবীজি (সা.)-এর মাধ্যমে জাহেলী যুগের এ কুপ্রথাকে ভেঙে দিলেন। নবীজি (সা.)-এর পালক পুত্র হযরত যায়েদ (রা.) তাঁর বিবি যয়নাব (রা.)-কে তালাক দিলেন। যয়নাব (রা.) সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। অনেক সাহাবী নবীজিকে যয়নাব (রা.)-কে বিবাহ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সামাজিক দুর্নামের প্রতি লক্ষ করে নবীজি (সা.) কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন–

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

আপনি লোকদের ভয় পাচ্ছেন! অথচ আল্লাহকে ভয় করা উচিত। (সূরা আহযাব, ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা হক বলতে কোনো পরোয়া করেন না। নবীজি (সা.)-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণে আল্লাহ তা'আলা আরশে মুআল্লায় হযরত যয়নাব (রা.)-এর সাথে নবীজি (সা.)-এর বিবাহ দিয়ে দিলেন। (বুখারী, সূরা আহযাব, ৩৭)

নবীজি (সা.) মহিলাদের হাতে মেহেদি লাগানোর তাগিদ করেছেন। যাতে হাত দেখেই মহিলা-পুরুষের পার্থক্য বোঝা যায়। একবার হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট এক মহিলার হাতের ওপর নবীজির নজর পড়েছিল। হাতে মেহেদি লাগানো ছিল না। নবীজি (সা.) বললেন, আমি কি পুরুষের হাত দেখছি, না মহিলার হাত। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা নিসা, ১১৯)

মোটকথা, সব বয়সী মহিলাদের হাতে মেহেদি থাকতে হবে, চুড়ি থাকতে হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে খ্রিস্টানদের অনুসরণে হাতে চুড়িও পরে না, মেহেদিও লাগায় না। আর অশিক্ষিত মেয়েরা শিক্ষিতদের দেখে তাদের মতো চলতে চায়। পাশ্চাত্যের অনুকরণের নিয়্যাতে মহিলাদের হাতে চুড়ি না থাকা, মেহেদি না থাকা হারাম। কারণ খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

من تشبه بقوم فهو منهم

'যে যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বল করল, তার হাশর সে জাতির সাথেই হবে।'

কিছু মূর্খ মহিলা মনে করে, বিয়ের আগে চুড়ি পরতে নেই। কোনো মেয়ে পরলে সকলে মিলে তাকে তিরস্কার করতে থাকে। দুই ধরনের ভুল সমাজে প্রচলিত আছে। কেউ মনে করে চুড়িই পরা যাবে না। আর কেউ মনে করে বিয়ের আগে

চুড়ি পরতে নেই। ইসলামের বিধান হলো, স্বামীর সামনে পর্দার প্রয়োজন নেই। গাইরে মাহরামের সাথে পর্দা করতে হবে। এর বিপরীতে হিন্দু ধর্মের রীতি হলো, বিয়ের আগে মহিলাদের মাথা খালি রাখতে হয়, আর বিয়ের পরে ঢাকতে হয়। বিশেষ করে স্বামীর সামনে ঘোমটা দিতে হয়। হিন্দুদের অনুকরণে আমাদের মা-বোনদের মাঝেও ইসলামবিরোধী রীতি পরিলক্ষিত হয়।

উল্লিখিত বড় বড় বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বিষয়েই আজ আমরা নবীজির সুন্নাতের অনুসরণ বাদ দিয়ে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করছি, যা মূলত ব্রিটিশ সিলেবাসে শিক্ষা লাভ এবং এর অনিবার্য পরিণতিতে পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক গোলামীর বিষফল। যদি আমাদের মুসলিম সমাজে দৃষ্টি দেওয়া হয় তবে এ অনুসরণের আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা আরো কিছু বিষয়ের শুধু শিরোনাম উল্লেখ করছি।

আমাদের মুসলমান পুরুষরা যে সকল বিষয়ে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করছে, তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো :

- কোট-প্যান্ট ও টাই পরা।
- টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা।
- পাঞ্জাবির সাথে ওড়না পরা।
- হাফ প্যান্ট পরা।
- ধুতি পরিধান করা।
- হাতে চুড়ি জাতীয় বস্তু পরা।
- স্বর্ণের অলংকার ও আসবাবপত্র ব্যবহার করা।
- সেলিব্রেটিদের স্টাইলে চুল কাটা।
- দাড়ি মুণ্ডানো বা স্টাইল করে কাটা এবং গোঁফ বড় রাখা।
- দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা।
- বিবাহের পূর্বে 'গার্লফ্রেন্ড' বানানো।
- গলায় চেইন পরাসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

আমাদের মুসলমান মা-বোনেরা যে সকল বিষয়ে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- টাইট-ফিট বা পাতলা কাপড় পরা।
- চুড়ি না পরা এবং হাতে মেহেদি না দেওয়া।
- কপালে টিপ দেওয়া।
- অফিস, ব্যাংক ও মার্কেটের রিসিপশনে দায়িত্ব পালন করা।
- পুরুষদের সঙ্গে চাকরি করা।
- পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হওয়া।
- বিবাহের পূর্বে 'বয়ফ্রেন্ড' বানানো।
- পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকরত তাদের মতো প্যান্ট-শার্ট পরা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি রাখা, চুলে বব কাটিং দেওয়া।
- নখ বড় রাখা।

শ্রেণীবিশেষের এ অনুকরণের পাশাপাশি সম্মিলিত মুসলিম সমাজও আজ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এ সকল বিভ্রান্তের মাঝে অন্যতম কয়েকটি বিভ্রান্তি হলো :

- চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়ার অভ্যাস করা।
- বাম হাতে খাওয়া, পান করা।
- চামচের প্রয়োজন নেই–এমন জায়গায় চামচ দিয়ে খাওয়া।
- খাবারের শেষে প্লেট চেটে খাওয়াকে অভদ্রতা মনে করা এবং প্লেটে খাবারের কিছু অংশ রেখেই উঠে যাওয়া।
- নায়ক-নায়িকা, খেলোয়াড় ও সঙ্গীতশিল্পীদের ছবিবিশিষ্ট গেঞ্জি বা শার্ট পরিধান করা।
- বেপর্দা ও গান-বাজনাসহ বিবাহের অনুষ্ঠান করা।
- বিয়েতে গায়ে হলুদ ও 'বধূবরণ' অনুষ্ঠান করা।
- ক্রুশের ছবিবিশিষ্ট পণ্য ব্যবহার করা।
- শখ করে কুকুর পালা।
- শোক প্রকাশে নীরবতা পালন করা।
- মাজারে বা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
- মাজারে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা করা। গোলাপ দেওয়া, সিজদা করা, মান্নত করা, প্রার্থনা করা।
- বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেওয়া। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো।
- মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা।
-জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, শোক দিবস, বার্থ ডে, ম্যারেজ ডে, থার্টিফার্স্ট নাইট, পহেলা বৈশাখ, নববর্ষ, ভলোবাসা দিবস, হোলি উৎসব ইত্যাদি পালন করা।
-ঘরে-বাইরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভাস্কর্য বা মূর্তি স্থাপন করা।
- আল্লাহ না বলে 'সৃষ্টিকর্তা', 'গড', 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' বলা। কোরআনকে 'ঐশী গ্রন্থ'' বলা।
- বিশেষ কোনো উপলক্ষে কেক কাটা ও উইশ করা। হাই-হ্যালো, ওকে, টাটা, গুড বাই, গুড মর্নিং ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ ও বিদায়ী সম্ভাষণ করা। মুসাফাহার পরিবর্তে 'হ্যান্ডশেক' করা।
- সন্তানকে 'বেবি কেয়ারে' রেখে আসা। বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো।
- ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা। সহশিক্ষা গ্রহণ করা।

এজাতীয় অসংখ্য বিষয়ে আজ আমরা কাফেরদের অনুসরণ করছি। অথচ হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

خالفوا اليهود والنصارى والمشركين অর্থাৎ তোমরা ইহুদি, নাসারা, মূর্তিপূজক এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।

বদনামের পরোয়া করো না। আমাদের শরীর, লেবাস-পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সব কিছুর দিকে তাকালে দেখা যায়, আমরা ১২ আনা কাফের-মুশরিকদের অনুসরণ করি আর ৪ আনা নবীজি (সা.)-এর অনুসরণ করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ১৬ আনাই নবীজি (সা.)-এর তুরিকা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই সর্বোত্তম তুরিকা। খোদাপ্রদত্ত জীবনাদর্শ। ইহুদি-খ্রিস্টানদের কিতাবেও লেখা আছে, মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, উমর (রা.) ন্যায়পরায়ণ খলিফা, কোনো জাতির মধ্যে উমর (রা.)-এর মতো দক্ষ ও নিষ্ঠাবান সেনাপতি পয়দা হয়নি।

মাইকেল এইচ হার্ট নামক এক খ্রিস্টান পৃথিবীর ১০০ মনীষীর জীবনী জমা করতে গিয়ে নবীজি (সা.)-কে সর্বপ্রথম স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে। যদিও এই বইয়ের ওপর আমরা সন্তুষ্ট না। কেননা, যদি বলা হয়, মুফতি সাহেব, বিড়াল, কুকুর এবং শিয়ালের মধ্যে মুফতি সাহেব শ্রেষ্ঠ। তাহলে এখানে মুফতি সাহেবকে সম্মানিত করা হয়নি; বরং বিড়াল, কুকুর এবং শিয়ালের সাথে তুলুনা করার কারণে মুফতি সাহেবকে অসম্মান করা হলো। অতএব এ বইয়ের মধ্যে কাফের-মুশরিকদের সাথে তুলনা করার কারণে নবীজি (সা.)-কে এক ধরনের অসম্মান করা হয়েছে। কাফের-মুশরিকদের তো আল্লাহ তা'আলা সূরা আ'রাফের ১৭৯ নং আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু থেকেও নিকৃষ্ট বলেছেন। এদের সাথে রাসূলের তুলনা করলে কি প্রশংসা হলো? অতএব এ বইয়ের প্রথমে নবীজিকে উল্লেখ করার দ্বারা বড়াই করার কিছু নেই।

যাহোক, স্বল্প সময়ে সবগুলো উল্লেখ করা তো সম্ভব নয়। এখানে নমুনাস্বরূপ মুসলিম সমাজে কাফের-মুশরিকদের অনুসরণের কিছু চিত্র পেশ করা হলো এবং এ অনুসরণের মূল কারণ যে ব্রিটিশের শিক্ষা সিলেবাস, তাও উল্লেখ করা হলো। আপনারা উলামায়ে কেরাম থেকে অল্প অল্প করে জেনে নিন যে আমরা আমাদের জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে নবীজির তুরিকা অনুসরণ করি আর কোন কোন ক্ষেত্রে কাফের-মুশরিকদের তুরিকা মেনে চলি। এবং হিম্মত করে বর্জনীয় বিষয়গুলো বর্জন করা শুরু করে দিন। বিশেষ করে ব্রিটিশ বিষবৃক্ষ (শিক্ষা সিলেবাস) থেকে সতর্ক থাকুন। অর্থাৎ স্কুল-কলেজে পড়ুয়া সন্তানদেরকে সময়-সুযোগমতো উলামায়ে কেরামের মজলিসে নিয়ে আসুন। উলামায়ে কেরামের সোহবাতে তাদেরকে দ্বীনি মানসিকতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন। বার্ষিক পরীক্ষার পর তাবলীগে পাঠিয়ে দিন। ইনশাআল্লাহ বিষবৃক্ষের ক্ষতি থেকে আপনার সন্তান বেঁচে যাবে। বর্তমান যমানায় তাবলীগ আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহমত। এর সাথে যে সহীহভাবে জুড়ে গেছে ইনশাআল্লাহ তাকে কেউ বেঈমান বানাতে পারবে না।

তাবলীগ ও দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা হলো এক পাখির দুই ডানা, বা এক সাইকেলের দুই চাকা, অথবা একটি পাইকারি মার্কেট, আরেকটি খুচরা মার্কেট। দাওয়াতুল হক থেকে শিখবেন, দাওয়াত ও তাবলীগে গিয়ে বিতরণ করবেন। উভয় মেহনতের মুরব্বি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। অথবা এভাবে বুঝুন, জামাআতের ওয়াপেসি কথার মধ্যে মারকায থেকে হেদায়েত দেওয়া হয় যে, "দেখুন, শুধুমাত্র চিল্লার দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীনদার বনা যায় না। আমরা আপনাদের কেবলমাত্র দ্বীনের সাথে জুড়ে দিলাম। বাকি দ্বীনের অন্য বিষয়গুলো এলাকায় গিয়ে হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে ওঠাবসা করে করে শিখে নেবেন।" মারকাযের এই হেদায়াত থেকে বোঝা গেল, প্রত্যেক এলাকায় হক্কানী উলামাদের থেকে দ্বীন শেখার একটা সিস্টেম থাকতে হবে। ওই সিস্টেমের নাম হলো দাওয়াতুল হক। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাবলীগের নিসবতে অনেক সময় লাগানোর তাওফীক দিয়েছেন। ছাত্রজীবনেও, মুফতি হওয়ার পরেও এবং আরব জামাআতের অনেক তরজুমানী করারও তাওফীক দিয়েছেন।

আমাদের এই মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ সকলেই তাবলীগওয়ালা। অধিকাংশ শিক্ষক সাল লাগানেওয়ালা। ছাত্রদের জন্য কানুন হলো, এক বন্ধে বাড়ির এলাকায় সময় লাগাবে, আরেক বন্ধে দাওয়াত ও তাবলীগে সময় লাগাবে। এই মাদরাসা একই সাথে ইলমের মারকায, দাওয়াতের মারকায এবং আত্মশুদ্ধির মারকায। ঘর একটা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে একটি ঘর দিয়ে দ্বীনের বিভিন্ন ধরনের খেদমত নিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ব্রিটিশ সিলেবাসের বিষ ফল থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করুন এবং উলামায়ে কেরামের সোহবাত, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দাওয়াতুল হকের সাথে জুড়ে থেকে দ্বীনের মেহনত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন

মাও. ইসমাতুল্লহ (ইফতা-প্রথম বর্ষ)

শানে সাহাবা : কোরআন-সুন্নাহ ও অন্য আসমানী গ্রন্থসমূহের আলোকে

মুফতী আতীকুল্লাহ

পবিত্র কোরআন-হাদীসে অনুসন্ধানপূর্বক এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবা বলতে সেসব পবিত্র আত্মার অধিকারী মহামনীষীগণকে বোঝায়, যাঁদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরানী সোহবত ও জ্যোতির্ময় সাহচর্য লাভে চির ধন্য করেছেন। যাঁদের রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাকীমানা তারবিয়াত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। যাঁদের পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, মানব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। যাঁরা মহা প্রজ্ঞাপূর্ণ নববী শিক্ষা ও দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এমন আলোর প্রদীপ জ্বালালেন, যার আলোয় উদ্ভাসিত হলো সারা বিশ্ব। হযরত আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (রহ.)-এর ভাষায় বলতে হয় "এককথায় সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় হলো, হৃদয়ের দিক থেকে মানবসমাজে পবিত্রতম, ইলম ও হিকমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে গভীরতম এবং লৌকিকতার দিক থেকে সহজতম। তাঁরা যখন কথা বলতেন, যমানা নিশ্চুপ হয়ে তাঁদের কথা শুনত এবং ইতিহাসের কলম তা লিখে রাখত।" (মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো? পৃ. ২০২)

ইতিহাস সাক্ষী তাঁদের জানা মতে, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আদম সন্তানের বসবাস রয়েছে, সেখানেই তাঁরা ছুটে গিয়েছেন এবং জান-মাল, মান-সম্মান ও জীবনসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তাদের মাঝে ইসলামের আলো পৌঁছাতে কোনো ধরনের ত্রুটি করেননি।

মন ব্যথায় জর্জরিত হয় যখন কোনো ব্যক্তি কিংবা দল এমন পবিত্র ও নূরানী জামাতের পবিত্র শানে নিজ অপবিত্র জবানে অসৌজন্য ও বেয়াদবিমূলক বাক্য উচ্চারণ করে। না জানি এসব বেয়াদব-কুলাঙ্গারের কথায় আমাদের বুজুর্গ ও বড়জনরা কত বেশি কষ্ট পেতেন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ এমন সব হীরণ্ময় মহামনীষীদের মর্যাদা-ফজীলত, আযমত-ওয়াকার ও মানবসমাজে তাঁদের গুরুত্ব ইতিহাসের আলোকে সবিশেষ আহলে কিতাবদের বাইবেলের আলোকে বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র, যাঁদের চেয়ে উত্তম কেউ মানবসভ্যতার ইতিহাসে না ছিল, না আছে, না কখনো হবে।

ইসলামী ইতিহাসের পাঠকদের এ কথা অত্যন্ত ভালোভাবেই জানা রয়েছে যে সেই সূচনালগ্ন থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফের-মুশরিক ও আহলে কিতাবদের দ্বন্দ্ব চলে আসছে–চাই তা ফিকরী ও চৈন্তিক হোক কিংবা সরাসরি।

পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)ও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত কোনো নবীর আসহাব, হাওয়ারীয়্যীন ও সাথী-সঙ্গীগণ তত বেশি ওয়াফাদার ও বিশ্বস্ত সাব্যস্ত হননি, যত বেশি হয়েছেন আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ। তাঁদের কোরবানী-জানেসারী, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তাঁদের প্রাণাধিক ভালোবাসা; আচার-আচরণে, বিচার-বিচরণে, কর্মে, কর্তব্যে ও জীবনের সর্ব ক্ষত্রে তাঁর আনুগত্য করা, নিজেদের সর্বসত্তা ও সর্বশক্তি তাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্যে সঁপে দেওয়াকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এত বেশি পছন্দ হলো যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে তাঁদের শুধু আমলের জগতেই নয় বরং ঈমানের জগতেও নমুনা ও আদর্শ বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবাতে ইরশাদ করেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।" (সূরা তাওবা : ১০০)

সূরায়ে তাওবার উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে ইযামকে নমুনা ও আদর্শরূপে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাঁদের মধ্যে যে কারো ইত্তেবা ও অনুসরণ করবেন সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে চির ধন্য হবেন এবং

চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও সর্বপ্রকার নায-নিয়ামতে পূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

সূরায়ে বাকারাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"অতঃপর তারাও যদি সে রকম ঈমান আনে, যেমন তোমরা ঈমান এনেছ তবে তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে। যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা মূলত শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন এবং তিনি সকল কথা শোনেন ও সব কিছু জানেন।" (সূরা বাকারা : ১৩৭)

কোরআনে কারীমে তাওরাত-ইঞ্জিলের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং পরস্পরের মধ্যে একে-অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে কখনও রুকুতে, কখনো সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হলো তাদের সেই গুণাবলি, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হলো। তারপর তা নিজ কাণ্ডের ওপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, কৃষক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এটা এই জন্য যে আল্লাহ তাদের উন্নতি দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" (সূরা ফাতহ : ২৯)

যদিও তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে, কিন্তু তার পরও তাতে এখন পর্যন্ত মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের যেসব পুস্তককে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাওরাত বলে স্বীকার করে এবং উভয় ধর্মে যা তাওরাত নামে অভিহিত, তার মধ্যে একখানি পুস্তকের নাম হলো 'দ্বিতীয় বিবরণ'। এ পুস্তকের (৩৩ : ২-৩) একটি স্তবক সম্পর্কে বলা যায় যে, কোরআন মাজীদের ইশারা সে দিকেই। তাতে রয়েছে,

"প্রভু সিনাই থেকে এলেন, সেয়ীর থেকে তাদের ওপর আলো দিলেন এবং ফারান পাহাড় থেকে তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দশ হাজার ভক্ত পরিবৃত হয়ে এলেন। তাঁর ডান হাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুনভরা আইন। তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন। তাঁর পবিত্র লোকসমূহ তাঁর অধীন এবং তারা সকল তাঁর পায়ে নত হয়ে আছে। তারই কাছে তাঁর হুকুম পায়। (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩৩ : ২-৩)

প্রকাশ থাকে যে এটি মুসা (আ.)-এর শেষ বক্তব্য। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার ওহী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সিনাই পাহাড়ে। এই ওহী দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হয়েছে সেয়ীর পাহাড়ে। এটি ইঞ্জিলের প্রতি ইঙ্গিত। কেননা, সেয়ীর ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রচারকেন্দ্র। বর্তমান এর নাম 'জাবালুল খলীল'। তারপর বলা হয়েছে তৃতীয় ওহী অবতীর্ণ হয়েছে ফারান পাহাড়ে। এর দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। কেননা, ফারানই হলো সেই হেরা পাহাড়। মক্কা বিজয়কালে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার। সুতরাং 'তিনি ১০ হাজার ভক্ত-পরিবৃত্ত হয়ে এলেন'–এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোরআনে করীমে বলা হয়েছে 'সাহাবাগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর' আর দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে 'তার হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন'। কোরআন শরীফে আছে ' তারা আপসের ভেতর একে-অন্যের ওপর দয়ার্দ্র'। আর দ্বিতীয় বিবরণে রয়েছে 'তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন। মার্কের ইঞ্জিলের আয়াতে উল্লিখিত একই উপমা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে প্রভুর রাজত্ব এ রকম, একজন লোক জমিতে বীজ বপন করল। তারপর সে রাতে ঘুমিয়ে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটাল। ইতিমধ্যে সেই বীজ হতে চারা গজিয়ে বড় হলো। কিন্তু কিভাবে হলো তা সে জানে না। জমি নিজে নিজেই ফল জন্মাল। প্রথমে চারা, পরে শিষ। অতঃপর শিষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা। ৬ দানা পাকার পরে সে কাস্ত লাগাল। কারণ ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। (মার্ক ৪ : ২৬-২৯)। অনুরূপ উপমা লুক (১৩-১৮, ১৯) ও মার্ক (১৩-৩১) ইঞ্জিলেও রয়েছে। (তাফসীরে তাওযীহুল কোরআন : ৩৭৯-৩৮০)

মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সাথী-সঙ্গীদের বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততা ও আনুগত্য-অবাধ্যতার কিছু ঘটনা :

পাঠকবৃন্দ, এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে মুসা (আ.) ও

ঈসা (আ.)-এর সাথী-সঙ্গীদের কিছু বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততা ও আনুগত্য-অবাধ্যতার কিছু ঘটনা এবং সাথে সাথে তুলে ধরা হবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণের বে-নজির বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের, আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের কিছু নমুনা ও ঘটনা, যা পড়ে পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন, সাহাবায়ে কেরাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সাথে সহায়-সম্পদ, ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন ও আপন প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা না আগে কখনো কেউ করতে পেরেছে, না পরে কখনো কেউ পারবে।

আসহাবে মুসা (আ.) :

হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন যে কিছু লোককে কান'আন ভূমিতে পাঠাও। হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিদের কান'আন ভূমিতে পাঠালেন,

১. শম্মুযা বিন যাক্কুর। ২. শাফাত বিন হোরী। ৩. কালেব বিন য়িফুন্নি। ৪. ইগার বিন ইউসুফ। ৫. হুশি বিন নূন (ইউশা বিন নূন)। ৬. পালতি বিন রাফু। ৭. জদ্দিয়েল বিন সোদি। ৮. জদ্দি বিন সুষি। ৯. আম্মিয়েল বিন জামালী। ১০. সাশুর বিন মীখায়েল। ১১. নহিব বিন দুপসি। ১২. গুয়ূয়েল বিন মাশি।

উপর্যুক্ত ১২ জন কান'আন ভূমিতে প্রায় চল্লিশ দিন যাবৎ গুপ্তরচরবৃত্তির ও অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে গেছেন। ফিরে এসে ১২ জনের মধ্যে ১০ জনই কান'আন ও আমালেকা গোত্রকে বনু ইসারঈলের সামনে এমন ভয়ানকরূপে উপস্থাপন করলেন যে কিছু নেককার ব্যক্তি ছাড়া পুরো সম্প্রদায় জিহাদ করতে অস্বীকার করে বসল। তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্বীকারকে কোরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

"হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন, তাতে প্রবেশ করো এবং নিজেদের পশ্চাদ্দিকে ফিরে যেও না; তাহলে তোমরা উল্টে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মুসা! সেখানে তো অতি শক্তিশালী এক সম্প্রদায় রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের না হয়ে যায় আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে অবশ্যই আমরা সেখানে প্রবেশ করব। যারা (আল্লাহকে) ভয় করত, তাদের মধ্যে দুজন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, (হযরত ইউশা বিন নূন (আ.) ও হযরত কালিব (আ.) বলল, তোমরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তোমরা যখন প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলার ওপরই ভরসা রেখো, যদি তোমরা মুমিন হও। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর (তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা তো এখানেই বসে থাকব। (সূরা মায়েদা : ২১-২৪)

ইংরেজি বাইবেলের গণনাপুস্তক : ১৩, আয়াত : ৩০-৩৩ এবং গণনাপুস্তক-১৪ এর ১-৪ নং আয়াতসমূহে অবাধ্য সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার বিবরণটি পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হচ্ছে।

"না! না! আমরা কান'আনবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না, তাদের ওপর আক্রমণ করতে পারব না। তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাদের রিপোর্ট বনি ইসরাঈলের জন্য হতাশাজনক হলো- তারা বনু ইসরাঈলের অন্য লোকদের বলল, ওই দেশের লোকদের পরাস্ত করার জন্য তারা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। তারা বলল, "আমরা যে দেশ দেখেছিলাম সে দেশটি শক্তিশালী লোকে পরিপূর্ণ। যারাই সেখানে গিয়ে থাকার দুঃসাহস দেখাবে, তাদের সেখানকার অধিবাসীরা খুব সহজেই পরাস্ত করতে পারবে–এমন শক্তি তাদের রয়েছে। আমরা সেখানে 'উনকের বেটা দৈত্যাকার নেফলীমদের দেখেছি। তাদের কাছে আমাদের ফড়িংয়ের মতো দেখাচ্ছিল। হ্যাঁ, আমরা তাদের কাছে ফড়িংয়ের মতো। সে রাতে সমস্ত লোক শিবিরের মধ্যে প্রবল চিৎকার শুরু করল এবং কান্নাকাটিও করল। বনু ইসরাঈল মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। সকল লোকেরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে বলল, "আমাদের মিসরে কিংবা মরুভূমিতে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এই নতুন দেশে এসে নিহত হওয়ার চেয়ে সেটাই বরং ভালো ছিল। যুদ্ধে নিহত হওয়ার জন্যই কি আল্লাহ আমাদের এই নতুন দেশে নিয়ে এলেন? শত্রুরা আমাদের হত্যা করবে এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে যাবে। মিসরে ফিরে যাওয়াই কি আমাদের জন্য ভালো নয়?"

তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, "এখন আমরা একজন নতুন নেতাকে নির্বাচন করব এবং মিসরে ফিরে যাব। মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) সেখানে সকলের সামনে উপুড় হয়ে পড়লেন। তখন ইউশা বিন নূন ও কালেব যারা সে দেশ অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন তাঁরা এ ঘটনায় বিচলিত হয়ে নিজেদের কাপড় ছিঁড়লেন। সেখানে উপস্থিত সকল লোককে বললেন, "আমরা যে দেশটি দেখেছি, সেটা খুবই ভালো। আল্লাহ যদি আমাদের ওপর খুশি হন, তবে সেই জায়গায় নিয়ে যাবেন এবং আমাদের সেই সমৃদ্ধ ও উর্বর দেশটি দিয়ে দেবেন। সুতরাং আল্লাহর বিরুদ্ধে যেও না। ওই দেশের লোকদের ভয় পেও না। আমরা তাদের সহজেই পরাস্ত করব। তারা আর সুরক্ষিত নয়, তা তাদের থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রভু আছেন। সুতরাং ভয় পেও না। কিন্তু নাফরমান সম্প্রদায় কথা মেনে নেওয়া দূরের কথা বরং তাদেরকে পাথর মেরে মেরে ফেলার হুমকি দিল। সে সময় সমাগম তাঁবুর ওপরে প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হলো এবং সকলেই তা দেখতে পেল। মুসা (আ.)-এর ওপর ওহী নাজিল হলো। প্রভু বললেন, "এসব লোকেরা আর কত দিন আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে? তারা তাদের মধ্যে আমার বহু অলৌকিক ঘটনা ও নিশানা অবলোকন করা সত্ত্বেও কত দিন আমাকে অবিশ্বাস করবে? আমি তাদের ভয়ংকরভাবে অসুস্থ করে দেব। অর্থ-সম্পদ ও মাল-দৌলত থেকে বঞ্চিত করব এবং তোমাকে এদের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করব। হযরত মুসা (আ.)-এর দু'আয় আল্লাহ তা'আলা এই অবাধ্য কওমকে মাফ করে দিলেন, কিন্তু নিজের সত্তার শপথ করে বললেন, "মিসর থেকে আমি যাদেরকে নিয়ে এসেছিলাম, তাদের কেউ কান'আন দেখতে পাবে না। কারণ তারা আমার মহিমা দেখেছে এবং মিসরে ও মরুভূমিতে আমি যেসব অলৌকিক কাজ করেছি তা দেখা সত্ত্বেও আমাকে ১০ বার পরীক্ষা করেছে এবং আমার অবাধ্যতা করেছে। আমি তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং আমি শপথ করেছিলাম যে আমি তাদের ওই জায়গা দিয়ে দেব। কিন্তু যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের কেউ সেই জায়গায় কোনো দিনও প্রবেশ করতে পারবে না।

...মরুভূমিতে তোমরা মারা যাবে। ২০ বছর অথবা তার বেশি বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তি যারা প্রত্যেকে আমার লোকদের একজন বলে গণ্য ছিল, তারা মারা যাবে। কারণ তোমরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে। সুতরাং যে দেশ আমি তোমাদের দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেখানে তোমাদের কেউ কোনো দিন প্রবেশ করতে পারবে না। কেবলমাত্র কালেব ও ইউশা সে দেশে প্রবেশ করতে পারবে। তোমরা ভয় পেয়েছিলে, অভিযোগ করেছিলে যে নতুন দেশে তোমাদের শত্রুরা তোমাদের থেকে তোমাদের সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে; কিন্তু আমি বলছি, আমি ওই সন্তানদের সেই দেশে নিয়ে আসব। তোমরা যা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো, তারা সেই জিনিসগুলোই উপভোগ করবে। কিন্তু তোমরা এই মরুভূমিতেই মারা যাবে। তোমাদের সন্তানরা ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে মেষপালক হয়ে থাকবে। তোমাদের অবিশ্বস্ততার জন্য তারা শাস্তি ভোগ করবে। তারা অবশ্যই এই কষ্ট ভোগ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা সবাই এই মরুভূমিতে মারা যাচ্ছো। তোমরা ৪০ বছর ধরে তোমাদের পাপের শাস্তি ভোগ করবে। তখন তোমরা বুঝতে পারবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে গেলে কী হতে পারে। আমি প্রভু। আমি শপথ করছি, এই মন্দ লোকেরা যারা একত্রে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি এ কাজগুলো করব। তারা সবাই এই মরুভূমিতে মারা যাবে। মুসা (আ.) যাদের নতুন দেশে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন তারাই এসে বনু ইসরাঈলদের মধ্যে অভিযোগ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা বলেছিল যে লোকেরা সে দেশে প্রবেশ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, সেসব লোক মহামারিতে মারা গেল। তাদের মধ্য থেকে শুধু ইউশা বিন নূন ও কালেব বেঁচে ছিলেন। হযরত মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে এসব কথা বললেন তখন সাধারণরা শোকে ভেঙে পড়ল। পরদিন খুব সকালে উঠে তারা পর্বতের চূড়ার দিকে এগোল। তারা বলল, "এই আমরা, প্রভু যে দেশের কথা বলেছেন চলো আমরা সে দেশে যাই। কারণ আমরা পাপ করেছি। কিন্তু মুসা (আ.) বললেন, তোমরা প্রভুর আদেশ পালন করছো না কেন? তোমরা সফল হবে না। তোমরা ওই দেশে যেও না। প্রভু তোমাদের সঙ্গে নেই, এই কারণে শত্রুরা সহজেই তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে। সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে আমালিকা ও কান'আনীরা যুদ্ধ করবে। তোমরা প্রভুর পথ থেকে সরে এসেছো। সুতরাং তোমরা যখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন না এবং তোমরা সকলই যুদ্ধে মারা যাবে। কিন্তু তারা মুসা(আ.)-কে বিশ্বাস করল না। তারা পর্বতের চূড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রভুর সাক্ষ্যসিন্দুক ও মুসা (আ.) তাদের সঙ্গে যাননি। এরপর উঁচু পর্বতের ওপরে বসবাসকারী আমালিকা এবং কান'আনীয়রা নিচে নেমে এসে তাদের ওপর আঘাত হানল এবং খুব সহজেই তাদের পরাস্ত করে হর্মা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা তাড়া করল। (বাইবেল, গণনাপুস্তক-১৩-১৪)

উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেল মুসা (আ.)-এর শিষ্যদের আনুগত্য ও অবাধ্যতার অবস্থা। এখন দেখা যাক ঈসা (আ.)-এর শিষ্য-শাগরিদদের কী অবস্থা।

আসহাবে ঈসা (আ.) : হযরত ঈসা (আ.)-এর ১২ জন শিষ্য ছিল, যাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. শাউন (পিতরস)। ২. তার ভাই ইন্দ্রিয়া। ৩. যাবদীর ছেলে ইয়াকুব (যাকোব)। ৪. ইউহান্না (যোহন, ইয়াকুবের ভাই)। ৫. ফিলিপস। ৬. বার্থলমাই। ৭. থোমা। ৮. কর আদায়কারী মত্তা/মথি। ৯. হলফীর ছেলে ইয়াকুব। ১০. তদ্দেয়। ১১. শামউন কাত্তানী। ১২. ইয়াহুদা ঈস্করিয়োতীয় (যে ঈসা আ.কে ধরিয়ে দিয়েছিল।) (ইনজিল মত্তা/মথি ১০ : ১-৪)

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর শিষ্যদের কিছু ঘটনা :

হযরত ঈসা (আ.) যখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠ রোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন সেই সময় তাঁর ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন, যার নাম ইয়াহুদা (যিহুদা) ঈস্করিয়োতীয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বলল, "আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিই, তবে আপনারা আমায় কী দেবেন বলুন?" তারা তাকে গুনে গুনে ত্রিশটা রুপার টাকা দিল। সেই মুহূর্ত থেকেই সে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে তাঁর শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করব? আপনি কী চান?" তিনি বললেন, "তোমরা ওই গ্রামে আমার পরিচিত একজনের কাছে যাও, তাকে গিয়ে বলো গুরু বলেছেন, আমার নির্ধারিত সময় কাছে চলে এসে গেছে, আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়িতে নিস্তারপর্ব পালন করব।" তখন শিষ্যরা তাঁর কথামতো কাজ করলেন, তাঁরা সেখানে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন। যখন সন্ধ্যা হলো, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর ১২ জন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে বসলেন। তাঁরা যখন খাচ্ছেন সেই সময় তিনি বললেন, "আমি তোমাদের নিকট সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে।" এতে শিষ্যরা খুবই দুঃখ পেয়ে একেকজন করে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রভু! সে কি আমি? তখন তিনি বললেন, "যে আমার সাথে বাটিতে হাত ডোবাল, সেই আমাকে শত্রুর হাতে সঁপে দেবে। যে তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সে বলল, "গুরু সে নিশ্চয়ই আমি নই? তাকে বললেন, তুমি নিজেই তো এ কথা বলছ।" তাঁরা খাচ্ছিলেন, এমন সময় ঈসা (আ.) একটি রুটি নিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলেন, আর সেই রুটি টুকরো টুকরো করে শিষ্যদের দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও, এ আমার দেহ..."

তিনি তাঁদের বললেন, আমার কারণে তোমরা আজ রাতেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। আমি এ কথা বলছি কারণ লেখা আছে, 'আমি মেষপালককে আঘাত করব। তাঁর মৃত্যু হলে পালের মেষরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আমি পুনরুত্থিত হলে পরে, তোমাদের আগে আগে গালীলে যাব। এর উত্তরে পিতর বললেন, "আপনার কারণে সকলেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু আমি কখনোই বিশ্বাস হারাব না।" ঈসা (আ.) বললেন, "আমি সত্যি বলছি, আজ রাতেই তুমি বলবে যে তুমি আমাকে চেনো না। ভোরে মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে চিনি না, এ কথা আমি কখনো বলব না। আপনার সঙ্গে আমি মরতেও প্রস্তুত।" অন্য শিষ্যরাও সকলে একই কথা বললেন। এরপর ঈসা মাসীহ তাঁদের সঙ্গে গেতশিমানী নামে একটা জায়গায় গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাকবে।" এরপর তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলতে থাকলেন। যেতে যেতে তাঁর মন উদ্বেগ ও ব্যথায় ভরে গেল, তিনি অবিভূত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাকো এবং আমার সাথে জেগে থাকো। পরে তিনি কিছুদূর গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার রব! যদি সম্ভব হয় তবে এই কষ্টের পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূরে যাক; তবু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" এরপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন, "একি! তোমরা আমার সঙ্গে এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না? জেগে থাকো ও প্রার্থনা করো, যেন প্রলোভনে না পড়ো। তোমাদের আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু দেহ দুর্বল।" তিনি গিয়ে আরেকবার প্রার্থনায় লিপ্ত হলেন "হে আমার রব! এই দুঃখের পানপাত্র থেকে আমি পান না করলে যদি তা দূর হওয়া সম্ভব না হয় তবে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" পরে তিনি ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যরা আবারো ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ভারী হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। তিনি আগের মতো সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন। পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা এখনো ঘুমিয়ে রয়েছ ও বিশ্রাম করছ? শোনো, সময় ঘনিয়ে এল, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ওঠো, চল আমরা যাই!

ওই দেখো! যে লোক আমায় ধরিয়ে দেবে, সে এসে গেছে।" তিনি তখনো কথা বলছেন, এমন সময় সেই ১২ জন শিষ্যের মধ্যে একজন যিহুদা সেখানে এসে হাজির হলো, তার সঙ্গে বহু লোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে এল। প্রধান যাজকরা ও সমাজপতিরা এদের পাঠিয়েছিলেন। যে তাকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে ওই লোকদের একটা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে বলেছিল, আমি যাকে চুমু দেব সেই ওই লোক, তাকে তোমরা ধরবে। এরপর সে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "গুরু, নমস্কার, এই বলে সে তাকে চুমু দিল। তিনি তাকে বলল–বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছ করো।" তখন তারা এগিয়ে এসে জাপটে ধরে ঈসা মাসীহকে গ্রেপ্তার করল। অন্যদিকে তার সকল শাগরিদ পালিয়ে গেল। ...পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন তখন একজন দাসী এসে বলল, "তুমিও গালীলে ঈসা মাসীহের সাথে ছিলে। কিন্তু পিতর সবার সামনে এ কথা অস্বীকার করে বলল, "তুমি কী বলছ, আমি তার কিছুই জানি না। তিনি যখন ফটকের সামনে গেলেন, তখন আরেকজন দাসী তাকে দেখে সেখানে যারা ছিল তাদের বলল, এ লোকটা নাসরতীয় মাসীহের সঙ্গে ছিল। পিতর অস্বীকার করল। সে শপথ করে বলল, "আমি ওই লোকটাকে মোটেই চিনি না। এর কিছু পরে সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পিতরের কাছে এসে বলল, তুমি ঠিক ওদেরই একজন, কারণ তোমার কথার উচ্চারণের ধরন
দেখেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।" তখন পিতর আবারো শপথ করে বলল,
"আমি ওই লোকটাকে আদৌ চিনি না।" আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল। (বাইবেল, মথি-২৬-২৭)

এই হচ্ছে আসহাবে ঈসা (আ.)-এর ওয়াফাদারী ও বিশ্বস্ততা, তাদের ত্যাগ ও আনুগত্য!!! এমন শিষ্যদের নিয়ে কি গর্ব করা সাজে?

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় আত্মোৎসর্গী সাহাবায়ে কেরাম :

আনুগত্যই হলো প্রেম ও ভালোবাসার স্বভাবপ্রকাশ। আর সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বান্তঃকরণে সর্বোচ্চ ভালোবেসেছিলেন। তাই তো দেখা যায়, তাঁরা নিজেদের সর্বসত্তা ও সর্বশক্তি তাঁর নিরঙ্কুশ-নিঃশর্ত আনুগত্যে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। কেমন ছিল তাঁর প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা? এটা তো এমন বিষয় নয়, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়; তা শুধু কল্পনা করে হয়তো অনুভব করা যাবে। আমার মনে হয় তা কল্পনার জগৎকেও হার মানাবে। তাই তো দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব (দা. বা.) বলেছেন, "সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে যে দরদভরা, আবেগপূর্ণ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বে-নজির গভীর সম্পর্ক ছিল; অনুকরণ-অনুসরণের অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক যে মাযবুত তা'আল্লুক ছিল তা দুনিয়ার কারো সাথে কারো, না হতে পারে, না হয়েছিল, না হবে; তার কোনো দৃষ্টান্ত না আগে কখনো ছিল, না আছে, না আগামীতে কখনো পাওয়া যাবে। তাঁদের সেই অতুলনী আনুগত্য ও আত্মত্যাগ, মোহাব্বত ও ভালোবাসা কিছুটা বোঝার স্বার্থে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়।

বদরযুদ্ধে সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর সেই মর্মস্পর্শী বক্তব্য :

গাযওয়ায়ে বদরের সময় হযরতের তেজদ্বীপ্ত ভাষণ আজও সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও আত্মত্যাগের, জানেছারী ও ওয়াফাদারী চির ভাস্বর হয়ে আছে। বদরযুদ্ধে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম থেকে তৃতীয়বারের মতো পরামর্শ চাইলেন তখন হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! হয়তো আপনার মনে এ ধারণার উদ্রেক হচ্ছে যে আনসার সাহাবীগণ শুধু নিজ ভূমিতে আপনাকে হেফাজত করা ও আপনার সাহায্যের জিম্মাদারি নিয়েছেন, শুনে রাখুন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আনসারদের পক্ষ হতে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, আপনি যেখানে ইচ্ছা যাত্রা করুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক গড়ুন কিংবা ছিন্ন করুন। আমাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করুন, যা ইচ্ছা আমাদের জন্য রাখুন; তবে আপনার রেখে দেওয়া অংশের চেয়ে গ্রহণ করা অংশই হবে আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। আর যে বিষয়ে যে আদেশ করবেন, আমাদের সব কিছুই হবে আপনার নির্দেশের তাবে ও অনুগত। আল্লাহর কসম! আপনি যদি সুদূর বারকে গামাদানও যেতে চান, আমরাও সঙ্গে যাব। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আমাদেরকে এই সাগরে ঝাঁপ দিতে বলেন আমরা ঝাঁপ দেব, কোনো ধরনের কুণ্ঠাবোধ করব না।

হযরত মিকদাদ (রা.)-এর তেজদ্বীপ্ত ভাষণ :

হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, "আমরা আপনাকে সে জবাব দেব না, যে জবাব বনি ঈসরাঈল মুসা (আ.)-কে দিয়েছে। মুসা (আ.)-এর গোত্র মুসা (আ.)-কে বলেছিল–

قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ

"তারা বলতে লাগল–হে মুসা! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশে অবস্থানরত থাকবে, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না। আর (তাদের

সাথে যুদ্ধ করতে হলে) তুমি ও তোমার রব যাও এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমরা তো এখানেই বসে থাকব।" (সূরা মায়েদা : ২৪)

বরং আমরা আপনার ডানে-বামে যুদ্ধ করে যাব, আপনার আগে-পিছে যুদ্ধ করে যাব।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ওয়াফাদারীর সত্যায়ন করেছেন এবং ইরশাদ করেন–

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

"এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে (তথা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছে) এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনো প্রতীক্ষায় আছে। আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।" (সূরা আহযাব : ২৩)

(কিছু রেওয়ায়াতে রয়েছে গাযওয়ায়ে ওহুদের কঠিন সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হেফাজত করার মাধ্যমে আনসারী সাহাবীগণ নিজেদের কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী ৭০ জন সাহাবা থেকে ৬৪ জনই ছিলেন আনসারে মাদীনা)। এটি ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরামের নিরঙ্কুশ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের শত শত নয়, হাজারো ঘটনার কয়েকটি ঘটনামাত্র। অনুরূপ হাজারো ঘটনা রয়েছে, যার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় সাহাবায়ে কেরামের সত্য ও সততার, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার, প্রাণাধিক প্রিয় হাবীবের জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগের। সেসব ঘটনায় তাঁর প্রতি তাঁদের এমন মোহাব্বত ও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়, যার তুলনা প্রেম ও প্রেমিকদের ইতিহাসে নেই। আরো কিছু ঘটনা বর্ণনার লোভকে সংবরণ করা যাচ্ছে না, তাই কিছু ঘটনা উল্লেখ না করে পারলাম না।

হযরত আনাস বিন নযরের বীরত্ব :

ওহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর ওপর আকস্মিক বিপর্যয় চলে এল এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল তখন হযরত আনাস বিন নযর শত্রু বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন আর পথিমধ্যে হযরত সা'আদ (রা.)-কে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন–

"হে সা'আদ ইবনে মুআয! চলো চলো জান্নাতে চলো, কা'বার রবের শপথ করে বলছি, আমি তো ওহুদের নিকটে জান্নাতের সুগন্ধি পেয়েছি।" সেই সুগন্ধি পেয়ে শাহাদাতের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে গেলেন জান্নাতে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমরা তাঁর শরীরে আশিটিরও বেশি তীর-তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন পেয়েছি।" (বুখারী শরীফ : ২৫৯৫, ৩৭৪২)

হযরত যায়দ ইবেন দাসিনা (রা.)-এর ওয়াফাদারী :

প্রতারণার শিকার হয়ে যখন হযরত খুবাইব (রা.), হযরত যায়দ ইবনে দাসিনা (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক কিংবা আসেম (রা.) দুশমনদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন, তখন পথিমধ্যে হযরত আসেম (রা.)-কে শহীদ করে দেওয়া হলো। আর হযরত যায়দ ইবনে দাসিনাকে ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ৫০টি উটের পরিবর্তে ক্রয় করে নিল পিতা হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য। যখন যায়দ ইবনে দাসিনা (রা.)-কে হত্যা করার জন্য হেরমের বাহিরে নিয়ে আসা হলো, তখন যায়দ (রা.)-এর তামাশা দেখার জন্য অনেক লোকের সমাগম হলো। তন্মধ্যে থেকে আবু সুফয়ান ইবনে হারব যায়দ (রা.)-কে আমোদ করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাইবে যে মুহাম্মদ তোমার স্থানে হোন? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম কখনো না, না! আমি এমনও চাইব না যে আমার মুক্তির জন্য তাঁর পা মোবারকে সামান্য কাঁটা বিঁধবে!" এ কথা শুনে উপস্থিত লোকরা তাঁকে উপহাস করতে লাগল। আর আবু সুফয়ান বলে উঠল, আল্লাহর কসম! কেউ কাউকে এমন ভালোবাসতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদের শিষ্যরা তাঁকে ভালোবাসে। (হায়াতুস সাহাবা, ৭৫/২)

ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী-এর স্বীকারোক্তি :

ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধিবিষয়ক আলোচনা থেকে ফিরে কুরাইশকে সম্বোধন করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি কিসরা, কায়সার ও নজ্জাসীর দরবার দেখেছি। আল্লাহর কসম, আমার চোখে পড়েনি এমন কোনো রাজা, যাকে তার সভাসদরা এতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, মোহাব্বত করে ও ভালোবাসে যতটা মুহাম্মদকে তাঁর সাহাবারা করে। তাদের অবস্থা হলো, যখন তিনি ওজু করেন, পানি মাটিতে পড়তে দেন না, এমনকি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কার আগে ওজুর পানি সংগ্রহ করবে। তিনি যখন কথা বলেন, তখন সবার মাঝে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে। আর আদবের প্রাবল্যে তারা তাঁর দিকে পূর্ণ নজরে তাকাতেও পারে না। (বুখারী)

ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মূর্তপ্রতীক হযরত আবু বকর (রা.) :

সেই হুদায়বিয়ার সন্ধির আলোচনার সময় ওরওয়া ইবনে মাসউদ যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, হে মুহাম্মদ! কই তোমার সাথে তো অভিজাত শ্রেণীর কাউকে দেখছি না, যাদের দেখছি তারা তো নিম্নশ্রেণীর লোক। তারা তো বিপদের সময় তোমাকে ছেড়ে পালাবে। তাঁর এ কথা

শুনে হযরত আবু বকর (রা.) অত্যধিক ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে কঠিন ভাষায় গালি দিলেন এবং বললেন–যাও, তুমি তোমাদের মাবুদ লাতের লজ্জাস্থান চেটে খাও!! কী ভাবছো! আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর আনীত দ্বীন ছেড়ে দেব? অসম্ভব।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)

নবীপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা কোনো আশেক-মাশুকের ইতিহাসে অপ্রতুল। তাঁর নবীভক্তি ও নবীপ্রেম কত গভীর ও অতলস্পর্শী ছিল, তা প্রমাণে ছওর পর্বতের গুহার সর্পদর্শনের সেই ঘটনাটিই যথেষ্ট। মদীনায় হিজরতকালে ছাওর পর্বতের একটি গুহায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও আবু বকর (রা.) আত্মগোপন করেছিলেন, সে সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সঙ্গী আবু বকর (রা.)-এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। গুহার একটি ছিদ্র পথে হযরত আবু বকর (রা.) পায়ের আঙুল ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে বিষাক্ত কোনো সাপ গুহায় প্রবেশ করতে না পারে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর কোলে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, একটি বিষধর সাপ তাঁর আঙুলে দংশন করে বসল। তিনি ব্যথায় কাতর হলেন ঠিকই; কিন্তু পা সরালেন না বরং কোনো প্রকার নড়াচড়া না করে বসে রইলেন, যাতে প্রিয় হাবীবের ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন এবং প্রিয় সঙ্গীর অবস্থা জানলেন। বললেন, আমাকে জাগালে না কেন? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন–ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পবিত্র নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে, এ রকম হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়। সুবাহানাল্লাহ!

সবারই জানা থাকার কথা যে যখন মক্কা মুকাররমায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩৯ জন তখন হযরত আবু বকর (রা.) হারাম শরীফে ইসলামের সর্বপ্রথম খুতবা দেন, যার ফলে দুশমনেরা তাঁর ওপর হামলে পড়ে ও নির্দয়ভাবে মারধর করে। তাদের আঘাতে আঘাতে তাঁর শরীর-চেহারা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়, যেন তাঁকে চেনাই মুশকিল হয়ে গেল এবং পুরোটা দিন মৃত্যুর মুখে ছিল। শেষ বিকেলে যখন হুঁশ ফিরে পেল তখন সর্বপ্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো, 'আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন?' এমনকি মা যখন মুখে কিছু দিতে চাইলেন তখনও একই প্রশ্ন আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? তাঁর কী অবস্থা? যখন বলা হলো, তিনি ইবনুল আরকামের বাড়িতে সুস্থ-নিরাপদে আছেন' তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, 'তাহলে আল্লাহর কসম, আল্লাহর নবীর দর্শন ছাড়া আমি খাদ্য-পানি গ্রহণ করব না।' এই ছিল রাসূলের প্রতি তাঁর ইশক-মোহাব্বতের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর সেই ঐতিহাসিক বাক্য তো সবার জানা থাকার কথা, যে বাক্য প্রবল ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছিলেন–

أينقص الدين وأنا حى

আমি বেঁচে থাকব, আর আল্লাহর রাসূলের আনীত দ্বীনের অঙ্গহানি হবে? তা কখনো হতে পারে না। আমার জীবন কী কাজে আসবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে গেলেন, আমি বেঁচে থাকব আর আমার উপস্থিতিতে সেই দ্বীনের অঙ্গহানি হবে? স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা বিধান করে গিয়েছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই স্তুতি পুরো জগৎ জানে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আবু বকরের মাল-দৌলত দ্বারা যত ফায়দা আমার হয়েছে, তত ফায়দা আর কারো মাল-দৌলত দ্বারা হয়নি।" আরো বলেছিলেন, "আমি সকলের প্রতিদান দিতে পেরেছি; কিন্তু আবু বকরের প্রতিদান দিতে পারলাম না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তার প্রতিদান প্রদান করবেন।"

হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বনামধন্য শিষ্য সেন্ট পিটার্স কি কখনো সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর সমতুল্য হতে পারে? হযরত ঈসা (আ.) সেন্ট পিটার্সকে বলেছিলেন, তুমি আজ রাতে মোরগ ডাক দেওয়ার পূর্বে আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে। তখন সে বলল, যদি তোমার সাথে মরতেও হয় তবু তোমাকে অস্বীকার করব না। কিন্তু ইঞ্জিল মথিতে রয়েছে, যখন শত্রুরা হযরত ঈসা (আ.)-কে গ্রেফতার করে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, পিটার্স বাহির আঙিনায় বসা ছিল। সে সময় একজন এসে যখন তাকে বলল, তুমিও তো তাঁর সাথে ছিলে, সে তখন সবার সামনে এ কথা বলে অস্বীকার করল, সে কী বলছে আমি জানি না। এভাবে তিনবার শপথ করে হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করল, আর ঠিক তৎক্ষণাৎ মোরগ ডাক দিয়ে উঠল।

উপর্যুক্ত ঘটনাদ্বয় দ্বারা সহজে অনুমান করা যায়, উভয়ের শাগরিদদের মধ্যে কত বেশি পার্থক্য।

পুরো জগদ্বাসী জানে হযরত বিলাল হাবশী (রা.)-এর আহাদ! আহাদ!! এর বলিষ্ঠ কণ্ঠধ্বনি। হযরত আবু যর গিফারী (রা.)-এর সে আযান, যা তিনি হারাম শরীফে শত্রুদের মাঝে দিয়েছিলেন। পুরো পৃথিবীবাসী জানে ইসলামের জন্য দ্বীনের জন্য হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর শাহাদাতের নির্মম ঘটনা। ইসলামের জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে নজির স্থাপন করেছেন হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) তা কি সবাই ভুলে গেছে। উম্মুশ শোহাদা হযরত খানসা (রা.)-এর কথা কি সবাই

জানে না?

আসহাবে মুসা (আ.), আসহাবে ঈসা (আ.) ও আসহাবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবস্থা

পর্যবেক্ষণে জ্ঞানীমাত্রই বুঝতে সক্ষম যে তাদের মধ্যে নিজেদের নবী ও পথপ্রদর্শকদের প্রতি কার কেমন আনুগত্য ও আত্মত্যাগ, মোহাব্বত ও ভালোবাসা ছিল। সহজেই অনুমেয় যে মুসা (আ.)-এর শিষ্যরা প্রতিটি পদে পদে আল্লাহ ও তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করেনি, সাথে সাথে ঈমানী দুর্বলতাও প্রকাশ করেছিল। আর ঈসা (আ.)-এর সাথী-সঙ্গীরাও সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন, সাথে ভরসাহীনতা ও ঈমানী দুর্বলতা তো ছিলই। আর সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তার কোনো নজিরও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে শেষ নবী রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবায়ে কেরাম প্রতিটি পদে পদে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈমান-ইয়াকিন ও তাওয়াক্কুল, দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা, উদারতা, সহনশীলতা, ধৈর্যধারণ, কোরবানী ও জানেসারী, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মতো আরো বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

উপরোক্ত তিন উম্মতের ঈমানী দুর্বলতা ও সবলতা, জিহাদী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না, প্রত্যেকের আকীদা-বিশ্বাস, শরয়ী সংবিধান, মু'আমালা-মু'আশারা, চলাফেরা, রীতি-নীতি ও জীবনযাপনের সর্বক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে।

মুসা (আ.)-এর শিষ্যদের ঈমানী দুর্বলতা তাদের জীবনে কী প্রভাব ফেলল :

তাদের ঈমানী দুর্বলতা, বিশেষ করে আখেরাতের ওপর ঈমানী দুর্বলতার কারণে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত তথা আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনাসহ অন্য পুস্তিকাসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে আখেরাতের আকীদা থেকে মুক্ত। তাদের ঈমানী দুর্বলতা, অতি দুনিয়ামুখিতার ফলে তারা মৃত্যুকে ভয় পেতে শুরু করে এবং হাজার বছর জীবিত থাকার স্বপ্নে বিভোর থাকত। এমনকি তাদের তাওরাত পর্যন্ত তাহরীফ ও বিকৃতি করে ফেলল।

স্বয়ং হযরত মুসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় গো বাচ্চা পূজা করা শুরু করে দিয়েছিল এবং প্রতিশ্রুত ভূমি তথা বায়তুল মাকদাস ও জেরুজালেমকে জিহাদের মাধ্যমে বিজয় করা থেকে অস্বীকার করা ও জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কঠিন আজাব ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। আমালেকার হাতে কিছু নিহত হয় এবং সিনা প্রান্তের তীহ নামক উপত্যকায় ৪০ বছর যাবৎ কঠিন শাস্তির ভোগ করতে হয়। এ ইহুদিরা নিজেদের দুনিয়ামুখিতা ও ঈমানী দুর্বলতার ফলে সারা জীবন হযরত ঈসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের বংশধররা অসংখ্যা নবী-রাসূলকে শহীদ করেছে। তাই তো তারা আজীবন অভিশপ্ত। তাদেরকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়। আজও সে অভিশপ্ত জাতি কপটতা, স্বার্থপরতা ও প্রতারণার সাথে মাল-দৌলত থাকা সত্ত্বেও প্রশান্তচিত্তে জীবন-যাপন করতে পারে না। ইউরোপের এমন কোন দেশটি আছে, যা থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয়নি। কোথাও তারা আশ্রয় পায়নি যৎসামান্য, যা পেয়েছে তাও মুসলমানদের স্পেনে। কিন্তু সাপ ও বিচ্ছুর মতো নিজের আশ্রয়দাতা মালিককেও তারা দংশন করতে ভোলেনি। যে আশ্রয়ের তিক্ত ফলাফল আজ শুধু মুসলিম রাষ্ট্র নয়, আমেরিকা পর্যন্ত ভোগ করছে এই দুষ্কৃতকারীদের কারণে।

ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের ঈমানী দুর্বলতার বিষক্রিয়া :

ইঞ্জিল মথি অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর নিজ শিষ্যদের বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তারা এক রাতের জন্য জাগ্রত থাকতে পারেনি। হযরত ঈসা (আ.) গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর মুক্তির ফিকর করেইনি উল্টো তাঁর সাথে যেকোনো ধরনের সংশ্লিষ্টতাকে অস্বীকার করে বসল, তাও আবার কোনো সাধারণ ব্যক্তি কিংবা সাধারণ শিষ্য নয় বরং সেন্ট পিটার্সের মতো শীর্ষস্থানীয় শাগরিদ। (ইঞ্জিল, মথি পুস্তিকা ২৬-২৭)

যখন বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁকে শূলিতে চড়ানো হচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ) তখন দুনিয়ার কোনো ঈসায়ী, না কোনো আম ব্যক্তি, না কোনো শাগরিদ সেখানে উপস্থিত ছিল।

ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের ঈমানী দুর্বলতা এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় দৃঢ় বিশ্বাসী না হওয়াতে কী হয়েছিল তা সাইয়েদ আলী হাসান আলী নদভীর (রহ.) ভাষায় শুনুন। তিনি বলেন,

'মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং মনোজগতের যাবতীয় জটিলতা নিরসনের যোগ্যতার ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম কখনো বিশদতা, ব্যাপকতা, স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার এমন পর্যায়ে ছিল না, যার ওপর কোনো সভ্যতার ভিত তৈরি হতে পারে, কিংবা যার আলোকে কোনো দেশ ও সমাজ সামনে অগ্রসর হতে পারে। তার পরও তাতে ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের ছিটেফোঁটা এবং সহজ-সরল তাওহীদি বিশ্বাসের হালকা ছাপ। কিন্তু সেন্ট পল এসে সেই শেষ আলোটুকুও নিভিয়ে দিলেন। যে প্রতিমা পূজার পরিবেশে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যে জাহিলিয়াত থেকে খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করেছিলেন, সেখানকার নানা সংস্কার-কুসংস্কার এবং ভ্রষ্ট চিন্তা-বিশ্বাসের তিনি তাতে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এরপর কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটি সম্পন্ন করেছেন কনস্টান্টাইন। ফলে খ্রিস্টধর্ম হয়ে পড়ে গ্রিক কল্পকথা ও রোমান প্রতিমাবাদ এবং মিসরীয় প্লেটোবাদ ও সন্ন্যাসবাদের অদ্ভুত এক মিশ্ররূপ। বলা যায়, খ্রিস্টধর্মে তখন সব কিছু ছিল, ছিল না

শুধু ঈসা (আ.)-এর সহজ-সরল শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ ও বিশ্বাস।' (মুসলিম উম্মাহ পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো? : ৭০)

সেন্ট পলের আধিপত্য ও ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের দুর্বলতার সুযোগে কাফফারায়ে যুনুব তথা গোনা মাফের আকীদা (Atonement) এবং ত্রিত্ববাদের আকীদার মতো সবচেয়ে ভয়ংকর আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে খ্রিস্টধর্মকে খ্রিস্টবাদ (Christianity) থেকে পলিত্ববাদ (Paulinity) হওয়াটাই যথাযথ মনে হচ্ছে। প্রচলিত আনাজিলে আরবা'আ তথা ইঞ্জিলচতুষ্ট (মথি, মার্ক, লূক ও ইয়ূহান্না/যোহন) এই চার ইঞ্জিলকে যদি আঠার শত বছর পরে ছেপে আসা ইঞ্জিলে বার্নাবাসের সাথে মোকাবেলা ও তুলনা করে দেখা হয় তবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টধর্মের শত্রুরা ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা-দীক্ষাসহ আসল ইঞ্জিলের মধ্যে বহু বিকৃতিসাধন করেছে, বিশেষ করে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামবিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে। ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারিয়্যীন তথা শিষ্যরা যদি ইলমী, আমলী ও ঈমানী ময়দানে সবল হতেন তবে আজ খ্রিস্টধর্মের যে বিকৃতরূপ মানুষের সামনে দৃশ্যমান তার জায়গায় যদি আসল রূপ থাকত তবে হয়তো মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখা লাগত না।

এ পর্যায়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণের ঈমানী, ইলমী, আমলী ও আখালাকী পূর্ণাঙ্গতা ও দৃঢ়তা সাথে সাথে জিহাদের প্রবল জোশ-জযবার ফলাফল কী হলো সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাদের সত্যতা ও সততা, তাঁদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, তাঁদের ঈমান-আমল, ইলম-তাকওয়াসহ বহু গুণের কথা কোরআন মাজীদে উল্লেখ রয়েছে। ইতিপূর্বে কিছু আয়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের সাথে যদি সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের সামনে থাকে তবে সাহাবায়ে কেরামের মান-মর্যাদা, তাঁদের মহত্ত্ব-মহিমা ও অপরিসীম গুরুত্ব-ফজীলত আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাও আবার আকওয়ালে মুসা ও ঈসা (আ.)-এর আলোকে, অর্থাৎ নিজেদের শিষ্যবিষয়ক তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের আলোকে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত সকল সৃষ্টি থেকে আমার সাহাবীগণকে বেছে নিয়েছেন। আর তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন চারজন [তাঁরা হলেন যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)]। তাঁদেরকে আমার সকল সাহাবার মধ্যে উত্তম বানিয়েছেন।

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন, "আমার প্রিয় সাহাবাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদের নিন্দা ও দুর্নাম করবে না। যে ব্যক্তি তাঁদের মোহাব্বত করে, সে আমাকে মোহাব্বত করার কারণে তাঁদের মোহাব্বত করে। যে ব্যক্তি তাঁদের ঘৃণা করে সে আমাকে ঘৃণা করার কারণে তাঁদের ঘৃণা করে। যে ব্যক্তি তাঁদের কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিল তার ধ্বংস অবধারিত।

রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দেবে না। তোমরা যদি ওহুদের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো তবে তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে আমার সাহাবাদের এক মুদের পরিমাণও হবে না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর আনীত দ্বীনকে সাহাবায়ে কেরাম গভীরভাবে ভালোবেসে ছিলেন বলেই আজ পৃথিবীজুড়ে ইসলামের জয়জয়কার। যদি সাহাবায়ে কেরাম ঈসা (আ.) ও মুসা (আ.)-এর সাথী-সঙ্গীদের ন্যায় ঈমান ও আমলে দুর্বল হতেন তবে সেন্ট পল ও সামরীর মতো আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাও ইসলাম ধর্মকে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের মতো বিকৃতি সাধনে সফল হয়ে যেত।

মুসলিম বিশ্বে যত ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার মোকাবেলায় হয়তো ইসলাম ধর্ম পেরে উঠতে পারত না। খারেজী ও শিয়াদের চক্রান্তের শিকার হয়ে সাহাবায়ে কেরাম জঙ্গে জমল ও ছিফফিনের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু কখনো ইসলামের ওপর কোনো আঁচড় পড়তে দেননি; না খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীগণ দিয়েছেন, না খলিফা হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর অনুগামীগণ দিয়েছেন। রোমের কায়সারের নাপাক ইচ্ছা [হযরত আলী (রা.)-এর ওপর কায়সারের আক্রমণের ইচ্ছা] সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত মু'আবিয়া (রা.) তার বিরুদ্ধে কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, সাবধান! তোর বিরুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সাহায্যে ও তাঁর নেতৃত্বে প্রথম সৈন্যটি আমি হব। ইনশাআল্লাহ!

ইসলাম ধর্মকে স্বমহিমায় ধরে রাখার জন্য প্রথমত সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনায় কালামে পাক হিফজ করে নিলেন। দ্বিতীয়ত রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসসমূহ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর

কৃত কাজসমূহ ও স্বীকার্যসমূহকে) ইত্যাদিকে মুখস্থ করে নিয়েছেন এবং লিখেও নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে পূর্বের উম্মত নিজেদের পবিত্র কিতাবসমূহকে হিফজ করেছিলেন কি না তার কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তো ধর্মদ্রোহীরা তাতে মনগড়া বিকৃতিসাধনে সফল হয়েছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম-রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন-কালামে ইলাহী ও কালামে রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হিফজ ও আমলের মাধ্যমে মুযবুতীর সাথে ধরে রাখতে পূর্ণাঙ্গ সফল হয়েছেন। ফলে ইসলামের শত্রুরা কিতাবে ইলাহীতে কোনো ধরনের তাহরীফ ও বিকৃতি সাধনের সুযোগই পায়নি। আর 'ওয়াযা'এ হাদীস' (মনগড়া হাদীস বানানো)-এর ফিতনাকে মুখলিস উলামায়ে কেরাম খুব সহজে প্রতিরোধ করেছেন। ইসলামের এক একটি রুকন ও অংশকে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সামলালেন তা ছিল এক কথায় অতুলনীয়।

তদ্রূপ হযরত উমর (রা.) হজের অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদের ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর যে ব্যক্তি রামাযান মাসে প্রকাশ্যে খানাপানি খাবে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছিল হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে। আর নামায ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা, নামায তো সকলের নিকট হক ও বাতেল, ন্যায় ও অন্যায় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সীমারেখা এঁকে দেয়।

মূল রহস্য হলো, সাহাবায়ে কেরাম, এ কথার কল্পনাও করতে পারেন না যে সুসংহত এই দ্বীনের কোনো ধরনের অঙ্গহানি হবে। আমাদের কারো চোখ খোলা থাকবে আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো হুকুম কিংবা ইঙ্গিত প্রকাশ করবে আর আমরা তা পালনে পূর্ণাঙ্গ সচেষ্ট হব না। মূলত সেই পূতপবিত্র সত্তাসমূহ নিজেদের জান-মাল, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ও শান-শওকাত এককথায় সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামকে স্বমহিমায় ধরে রেখেছেন। চতুর্দিকে ইসলামের শাশ্বত বাণীকে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে তাঁদের মতো অটল, অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকতে পারে।

এই দীর্ঘ আলোচনায় আমরা নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরামের গুরুত্ব, ফজীলত মর্যাদা সম্পর্কে কিঞ্চিত হলেও বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। এটিও নিশ্চয় আমাদের বোধগম্য হয়েছে যে একটা দ্বীন সহীহ-শুদ্ধ অবিকৃতভাবে আগন্তুক প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছতে সাহাবায়ে কেরাম তথা নবীর সাহচার্যপ্রাপ্ত সঙ্গী-সাথীদের গুরুত্ব কতটুকু।

আর এ কারণেই ইসলামকে যারাই ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে তারা সর্বপ্রথম আঘাতটা সাহাবায়ে কেরামের ওপর করেছিল। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে সফল না হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমানদের অন্তর থেকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন মিথ্যারোপ করা হয়েছে। ভিন্নধর্মীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন এমন দলও সৃষ্টি হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কেরামকে গালমন্দ করেছে। সাহাবায়ে কেরামকে কাফের পর্যন্ত বলা হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ)

এসব বাস্তবতার নিরিখে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যেমন সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনের জন্য সত্যের মাপকাঠি মেনেছেন, তেমনি বাতিল পরিচয়েও সাহাবা দুশমনীকে অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটির ওপর পুরো উম্মত ঐক্যবদ্ধ।

সে কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত যেকোনো নতুন ফেরকা বা দলকে প্রথমে সেই মাপকাঠি দিয়েই বিবেচনা করে থাকেন। অর্থাৎ উক্ত দলের কাছে সাহাবায়ে কেরামের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটুকু। তাদের আমলে সাহাবায়ে কেরামকে কতটুকু ফলাও করা হয়?

যখন দেখে কোনো দল সাহাবায়ে কেরামকে কাফের-মুশরিক পর্যন্ত বলতে ছাড়ে না। তখন আহলে সুন্নাত জামআত তাকে কাফের হওয়ার ফাতওয়া দিয়ে থাকে। যদি দেখে কেউ সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে তাকে ফাসেক এবং গোমরাহ হওয়ার ফাতওয়া দিয়ে থাকে। কেউ যদি বলে সাহাবায়ে কেরামের আমল এবং কথা ইসলামের দলিল নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআত তাকে ভ্রষ্ট বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকে। কেউ যদি এমন আমল সমাজে চালু করতে চায়, যা সাহাবায়ে কেরাম করেননি এবং সাহাবায়ে কেরাম করেছেন কি না তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করে না তাকে বিদ'আতী বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকে।

কারণ শুরুতেই বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম হলেন রাসূল (সা.)-এর জানেসার সঙ্গী হয়ে দ্বীনে ইসলামকে সারা পৃথিবীতে প্রচার-প্রসারে আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা। এ কারণেই ইসলাম সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় সহীহ-শুদ্ধ, অবিকৃত এবং অক্ষতভাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আঘাত হানা মানেই হলো পুরো ইসলামের ওপর আঘাত হানা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কেরামের নকশে কদমের ওপর চলার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

জুমু'আর দিন ৮০ বার দরূদ পাঠের হাদীস ও কিছু কথা

মুফতী মাহমূদ হাসান

সিদ্ধান্ত হওয়া বিষয়গুলোতে নতুন করে মতপার্থক্য সৃষ্টি করা এখন এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে। বাতিল ফিরকাগুলো তো মুসলমানদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টির পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে এসব করে থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ঘরানার কিছু ব্যক্তি এরূপ রীতি কেন গ্রহণ করছেন বোঝা মুশকিল। সালাফে সালেহীনদের মাঝে কাল-মহাকাল থেকে চলে আসা কোনো আমলকে হাদীসে নেই, হাদীস থাকলে সেটা যঈফ বা ভিত্তিহীন বলে ওই আমল রুখে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। উলূমুল হাদীসে পরিপক্ব নন, এমন লোকেরাও এরূপ কাজে জড়িত হচেছন বলেও ধারণা করা হয়। যারাই করুন না কেন বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। হাজার বছর থেকে সালাফে সালেহীনের অনুসৃত আমল বর্তমান ফেতনার যুগে এসে হাদীসে নেই মন্তব্য করে আমলটার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা উম্মতের জন্য কল্যাণকর নয়, আবার কারো জ্ঞান পরিপক্বতার পরিচায়কও নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আমলের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের বিরোধিতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ উক্ত আমলকে বাতিল বলা যাবে না। যেকোনো আমল এবং সুন্নাহকে সহীহ যঈফ বলার জন্য সেটাও একটা দলিল। বরং প্রকৃত দলিল।

জুমু'আর দিন আসরের পরের নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফের আমল একটি ফজীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু এ আমলটির ব্যাপারে কিছু লোককে আপত্তি করতে শোনা যায়। তাঁরা বলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ সংখ্যায় দরূদ শরীফের এ আমলের বিশেষ ফজীলত বিশুদ্ধ সূত্রে কোনো হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না। এ জন্য তা আমলযোগ্য নয়। আমরা এখানে হাদীসটি আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কিছু আলোচনা করব। তবে এর পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ প্রাসঙ্গিক দুটি কথা স্মরণ রাখা উচিত।

বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হওয়াই শরীয়তের দলিল হওয়ার শর্ত নয় :

প্রথম কথা হলো, কোনো আমল প্রমাণিত হওয়ার একমাত্র পদ্ধতিই তা বিশুদ্ধ সূত্রে কোনো হাদীসের কিতাবে পাওয়া যাওয়া নয়, যদিও তা একাধিক পদ্ধতির মধ্য থেকে একটি পদ্ধতি। যুগে যুগে হক্কানী আলেমগণসহ মুসলিম উম্মাহের ধারাবাহিক আমলও দলিল হিসেবে যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এক প্রসঙ্গে বলেন,

فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد ـ

অর্থাৎ, অতএব এটি উম্মতের একদল থেকে অন্য দলের বর্ণনা, যা কখনো একেকজনের বর্ণনা থেকে শক্তিশালী হয়ে থাকে। (আর রিসালা, পৃ : ১৩৭)

ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন,

إذ التوارث والتعامل بها من لدن النبى - صلى الله عليه وسلم -وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه ـ (فتح القدير)

অর্থাৎ নবী করীম (সা.)-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুগে যুগে চলে আসা আমল প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো একটি সহীহ হাদীস পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। (ফাতহুল কাদীর ৬/১৫৩)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. স্বীয় কিতাব 'হুজ্জিয়তে হাদীস'-এ মুসলমানদের মধ্যে নবী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সুন্নাত সংরক্ষণের চারটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে তিন নম্বর পদ্ধতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যুগে যুগে মুসলমানদের আমল। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও পর্যায়ক্রমে যুগে যুগে ধারাবাহিক আমলের মাধ্যমেও সুন্নাতের সংরক্ষণ হয়েছিল। এর দ্বারা বোঝা গেল মুসলিম উম্মাহের ধারাবাহিক আমলও সংরক্ষিত সুন্নাত হিসেবে স্বীকৃত।

দ্বিতীয় কথা হলো, একটি বর্ণনার সূত্র বর্তমানে প্রচলিত কিতাবসমূহে পাওয়া না যাওয়া অকাট্যভাবে এ কথা প্রমাণ করে না যে, কোনো কিতাবেই কখনো তার সনদ নেই। কেননা মুহাদ্দিসগণের লিখিত অনেক কিতাবই এমন আছে, যা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে এবং বর্তমান যুগে পাওয়া যায় না, এমন কোনো কিতাবে কি তার বিশুদ্ধ সনদ পাওয়া অসম্ভব? বিদগ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন,

ولعلهم اطلعوا له على سند يصلح للاحتجاج به، وعدم اطلاعنا عليه لا يستلزم ضعفه ولا رده، لقصور نظرنا وقلة عدتنا، فكثير من كتب الأحاديث وأسماء الرجال لم يبق لها فى هذا الزمان غير الاسم، ولم نقف لها على رسم ـ

অর্থ : হয়তো ওই সকল ইমাম হাদীসটির নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ পেয়েছেন। আর আমাদের অযোগ্যতা ও দৈন্যতার দরুন হাদীসটি না পাওয়া তা অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য হওয়ার দলিল নয়। কেননা এমন অনেক হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের কিতাবই আছে বর্তমানে, যার নাম ছাড়া আর কিছুই পৃথিবীতে অবশিষ্ট নেই, এর কোনো চিহ্নও বর্তমানে পাওয়া যায় না। (কাওয়াইদ ফী উলূমিল হাদীস, পৃ: ৭২)

শব্দের পার্থক্যে মৌলিকভাবে হাদীসটি প্রমাণিত :

এবার আসি আমরা মূল কথায়। তা হলো, নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফের বিশেষ ফজীলত সম্পর্কে প্রচলিত হাদীসের সামান্য কিছু অংশের বিশুদ্ধ সূত্র পাওয়া না গেলেও মূল অংশের সমর্থনে মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়। তাতে মৌলিকভাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। অতএব মৌলিকভাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ায় এবং তদানুযায়ী আমল শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করা অবশ্যই ভুল।

এর চেয়েও বড় কথা হলো, দরূদ শরীফ প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টার যেকোনো সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল, যা বলাই বাহুল্য। আর জুমু'আর দিন অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ার কথা একাধিক সহীহ হাদীসে এসেছে। সাথে সাথে একটি শক্তিশালী মতে জুমু'আর দিন আসরের পরের সময়টুকু হলো দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত। তাই এ সময়ে দরূদ শরীফের আমল যে বড় সাওয়াবের কাজ–তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জুমু'আর দিন অধিক পরিমাণে দরূদের ফজীলত সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহ

এক.

عن أوس بن أوس، قال :قال النبى صلى الله عليه وسلم :إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة على

অর্থ : "হযরত আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই জুমু'আর দিন শ্রেষ্ঠতম দিনগুলোর অন্যতম। সুতরাং সেদিন তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পড়ো। নিশ্চয়ই তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস : ১৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হা. ১৬১৬২; সহীহ ইবনে হিববান, হা. ৯১০) হাদীসটি সহীহ।

দুই.

عن أنس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :أكثروا الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فمن صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا "

অর্থ : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমরা জুমু'আর রাত ও জুমু'আর দিনে আমার ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করেন। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী হা. ৫৯৯৪; ফাযাইলুল আওকাত, বায়হাকী হা. ২৭৭) এর সনদ হাসান পর্যায়ের।

তিন.

عن أبى أمامة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :أكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة؛ فإن صلاة أمتى تعرض على فى كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة ."

অর্থ : হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "প্রত্যেক জুমু'আর দিনে তোমরা আমার ওপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করো। কারণ আমার উম্মতের দরূদ প্রতি জুমু'আর দিন আমার কাছে পেশ করা হয়। আর তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করে সে অন্যদের তুলনায় আমার বেশি নিকটবর্তী। (সুনানে বায়হাকী হা. ৫৯৯৫) এর সনদ হাসান। (আলকওলুল বাদী, পৃষ্ঠা : ৩২০)

চার.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক শাগরেদ যায়েদ ইবসে ওয়াহাবকে নসীহত করেন–

يا زيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول :اللهم صل على محمد النبى الأمى

"হে যায়েদ বিন ওয়াহাব! জুমু'আর দিন তুমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এক হাজার বার দরূদ পড়তে ভুল করো না। এভাবে বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ.

(আততারগীব ওয়াত তারহীব, আবুল কাসেম আততাইমী হাঃ ১৬৮১; তারীখু আসবাহান, আবু নুআইম ২/১৪২)

উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা বিশেষভাবে জুমু'আর দিন অধিক পরিমাণে দরূদ পড়ার গুরুত্ব ও ফজীলত প্রমাণিত হয়।

৮০ বার দরূদ পাঠের হাদীস :

এবার আমরা আসি আমাদের মূল আলোচ্য জুমু'আর দিন আসরের পর জায়গা ত্যাগ করার পূর্বে ৮০ বার দরূদ পাঠের হাদীস সম্বন্ধে। আমরা পূর্বের ভূমিকা ও আলোচ্য হাদীসগুলোকে সামনে রেখে এ হাদীসটির পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে হাদীসটি পরিত্যাজ্য ও অগ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হাফেয সাখাবী (রহ.) তাঁর অনন্য কিতাব "আলকওলুল বাদী ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শাফী"তে বর্ণনা করেন,

وفى لفظ عند ابن بشكوال من حديث أبى هريرة أيضا من صلى صلاة العصر من يوم الجمعة فقال قبل أن يقوم من مكانه اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آله وسلم تسليما ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما وكتبت له عبادة ثمانين سنة ونحوه عن سهل كما سيأتى.

অন্য শব্দে ইবনে বাশকুয়াল (রহ.)-এর বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসর নামাযের পর নিজ স্থান ত্যাগ করার পূর্বে ৮০ বার এ দরূদ পাঠ করবে

اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى آله وسلم تسليما

তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হবে এবং ৮০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব দেওয়া হবে।" সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা শীঘ্রই সামনে আসছে। (আলকওলুল বাদী, পৃষ্ঠা : ২৮৪)

উক্ত কিতাবের খানিক সামনে গিয়ে হাফেয সাখাবী (রহ.) বলেন,

وعن سهل بن عبد الله قال من قال فى يوم الجمعة بعد العصر اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى إله وسلم ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما أخرجه ابن بشكوال وقد تقدم قريبا فى حديث أبى هريرة معناه.

হযরত সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসরের পর আমার ওপর ৮০ বার এ দরূদ পাঠ করবে

اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى إله وسلم

তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" হাদীসটি ইবনে বাশকুয়াল (রহ.) স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এ মর্মে খানিক পূর্বে আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আলকওলুল বাদী, পৃষ্ঠা : ২৮৫)

সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণনাটি ইবনে বাশকুয়াল (রহ.) তাঁর কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেন,

وروينا عن :قال شيخنا أبو القاسم سهل بن عبد الله قال من قال فى يوم الجمعة بعد العصر اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى إله وسلم ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين سنة.

আমাদের শায়েখ আবুল কাসেম (রহ.) বলেন, সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসরের পর আমার ওপর ৮০ বার এ দরূদ পাঠ করবে

اللهم صل على محمد النبى الأمى وعلى إله وسلم

তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (আলকুরবাহ, ইবনে বাশকুয়াল, পৃ: ১১৪ হাঃ ১১৪)

এখানে ইমাম ইবনে বাশকাওয়াল (রহ.) হাদীসটি তাঁর শায়খ আবুল কাসেম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন। আর আবুল কাসেম (রহ.) তা সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে মুআল্লাকান তথা সূত্রবিহীন উল্লেখ করেন। আর সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহও হাদীসটি সূত্রবিহীন উল্লেখ করেছেন। তবে এই সূত্র বিচ্ছিন্নতায় হাদীসটি একেবারেই পরিত্যাজ্য বলা যায় না। কেননা এর সমর্থনে আমরা সূত্রসহ হাদীসও পেয়ে থাকি, যা সামনে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এ ছাড়া উসূলিয়্যীনদের মতে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রহীন ও সূত্র বিচ্ছিন্ন বর্ণনাও গ্রহণযোগ্য। এর সাথে যদি তার সমর্থনে গ্রহণযোগ্য সূত্রও পাওয়া যায়, তাহলে তো আর আপত্তির অবকাশ থাকে না। ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত হাদীস ও ফিকহ নীতি শাস্ত্রবিদ ইমাম আমেদ (রহ.) বলেন,

والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য মত হলো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি মুরসাল (উসূলিয়্যীনদের পরিভাষায় সকল প্রকার সূত্র বিচ্ছিন্ন হাদীসকেই মুরসাল বলা হয়) বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। (আল ইহকাম ২/১২৩)

আমরা দেখতে পাই, এখানে প্রথম বর্ণনাকারী ইবনে বাশকুয়াল একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। তাঁর সম্বন্ধে ইবনে আব্বার (রহ.) বলেন,

كان متسع الرواية شديد العناية بها عارفا بوجوهها، حجة، مقدما على اهل وقته حافظا حافلا

অর্থাৎ তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীস শাস্ত্রে অধিক গুরুত্বদানকারী, বিজ্ঞ, দলিলযোগ্য ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস। (সিয়ারু আলামীন নুবালা ২১/১৪০)

তারপর ইবনে বাশকাওয়ালের শায়খ আবুল কাসেম। তিনিও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে তাঁর ছাত্র ইবনে বাশকুওয়াল (রহ.) নিজ কিতাবে উল্লেখ করেন,

فصار صدرا فى المفتيين بها لسنة وتقدمه ، ومن بيئة علم ونباهة وفضل وصيانة وكان ذاكرا للمسائل والنوازل، دربا فى الفتوى، بصيرا بعقدالشروط وعللها ، مقدما فى معرفتها اخذ الناس عنه واختلفت اليه واخذت عنه (صلة ابن بشكوال ٨٢)

অতঃপর বর্ণনাকারী সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ আততুস্তারী (রহ.) তিনি একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ সুফী ছিলেন। হাফেজ যাহাবী (রহ.) তাঁর সম্বন্ধে বলেন, سميه الزاهد المحدث অর্থাৎ তাঁর সমনাম হলো দুনিয়াবিমুখ মুহাদ্দিস"। (সিয়ারু আলামীন নুবালা ১৩/৩৩৩)

অতএব বর্ণনাটির তিনজন বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হওয়ার পর উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে বর্ণনাটি একেবারে পরিত্যাজ্য বর্ণনার আওতায় পড়তে পারে না।

হাফেয সাখাবী (রহ.) তাঁর কিতাবে শব্দের সামান্য ভিন্নতায় হাদীসটি এভাবেও বর্ণনা করেন,

وعند الدارقطنى مرفوعا بلفظ من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة قيل يارسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك، النبى الأمى وتعقد واحدة.

হাদীসটি ইমাম দারাকুতনি (রহ.)-এর সূত্রে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ শব্দে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে আমার ওপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এভাবে বলবে,

اللهم صل على محمد عبدك ونبيك

ورسولك، النبى الأمى

এভাবে গুনে গুনে ৮০ বার পূর্ণ করবে। (আলকওলুল বাদী, পৃষ্ঠা : ২৮৫)

উক্ত বর্ণনাটি একাধিক ভাষ্যে একাধিক কিতাব থেকে হাফেয সাখাবী (রহ.) সূত্রবিহীন 'মুআল্লাক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে সাখাবী (রহ.)-এর উল্লিখিত সূত্রবিহীন হাদীসটির সূত্র মূল কিতাব থেকে বের করে তার মান সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত জানব। এর পূর্বে আমরা হাফেয সাখাবী (রহ.)-এর ভাষায়ই হাদীসটি সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণের মতামত জানব।

হাদীসটির মান নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত :

যদিও এরূপ ভাষ্যে বর্ণিত হাদীসটির কিছু সূত্রের ব্যাপারে কোনো কোনো মুহাদ্দিস আপত্তি তুলেছেন এবং সূত্র দুর্বল হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন, কিন্তু দুর্বল সূত্রগুলো বাদ দিলেও তার গ্রহণযোগ্য সূত্র বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই অনেক মুহদ্দিসগণ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। হাফেয সাখাবী (রহ.) বলেন,

قلت :وحسنه العراقى ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان ويحتاج إلى نظر وقد تقدم نحوه من حديث أنس قريبا.

অর্থাৎ "আমি বলি, উক্ত হাদীসটি হাফেয ইরাকী (রহ.) এবং তাঁর পূর্বেও শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে নোমান (রহ.) 'হাসান' বলেছেন। যদিও এর ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তার অবকাশ রয়েছে, তার পরও এর সমর্থনে পূর্বেও হযরত আনাস (রা.) সূত্রে এরূপ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।" (আলকওলুল বাদী, পৃষ্ঠা : ২৮৫, আরো দেখুন আদ্দুররুল মানযূদ, ইবনে হজর মক্কী পৃষ্ঠা : ২১২)

হাফেয ইরাকী (রহ.) তাঁর কিতাবে হাদীসটি 'হাসান' হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন এবং শায়েখ আবু আব্দুল্লাহ ইবনে নোমান (রহ.) থেকে হাদীসটি 'হাসান' হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেন। (দেখুন : আলমুগনি আন হামলিল আসফার, হাফেয ইরাকী, পৃ. ২২০)

এবার আসুন! হাদীসটির সূত্রসহ বর্ণনায়। ইমাম ইবনে শাহীন, ইমাম দারাকুতনি ও ইবনে বাশকুয়াল (রহ.) স্ব-স্ব সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে শাহীন (রহ.) স্বীয় সূত্রে এভাবে বলেন,

حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبى، وأحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير، قالا :نا سعيد بن محمد بن ثواب، أنا عون بن عمارة، أنا سكن البرجمى، عن حجاج بن سنان، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، أظنه عن أبى هريرة، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الصلاة على نور على الصراط فمن صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما.

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার ওপর দরূদ পাঠ পুলসিরাতের আলো, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে আমার ওপর ৮০ বার দরূদ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। (আত্তারগীব ফী ফাযাইলিল আমাল, ইবনে শাহীন, হাঃ ২২, আলকুরবাহ, ইবনে বাশকুয়াল, পৃ. ১১১ হাঃ ১০৯, আলআফরাদ, দারাকুতনি হাঃ ৫০৯৫)

হাফেয সুয়ূতি (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব 'আল জামিউস সগীর'-এ হাদীসটি উল্লেখ করে তাকে 'হাসান' বলেছেন। (দেখুন : আল জামিউস সগীর, হাঃ ৫১৯১)

সুতরাং ৮০ বার দরূদ পাঠের ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীসটির মানের ব্যাপারে এ পর্যন্ত বড় বড় মুহাদ্দিসের সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া গেল। শায়েখ ইবনে নোমান, হাফেয ইরাকী ও হাফেয সুয়ূতী (রহ.)-এ তিনজনই সুস্পষ্টভাবে হাদীসটি 'হাসান' হওয়ার পক্ষে।

সূত্র যঈফ মানলেও হাদীসটি আমলযোগ্য :

আর যদি উল্লিখিত তিন মুহাদ্দিসের কথা উপেক্ষা করে হাদীসটির সকল সূত্রকেই যঈফ ও দুর্বল বলি। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, তাহলেও হাদীস অনুযায়ী আমল করতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা এ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো আলেম বা মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মওযূ তথা জাল বলেননি। আর জাল না হয়ে শুধু কেবল সনদ দুর্বল হলে তা মুহাদ্দিসগণের নিকট কোনো কোনো ক্ষেত্রে হালাল-হারাম ও বিধানাবলিতেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমলযোগ্য, বিশেষত তারগীব-তারহীব তথা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমলযোগ্য।

হ্যাঁ, এতদসত্ত্বেও কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে অনেক মুহাদ্দিস ফাজায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে তা 'যঈফে ইয়াসীর' তথা সামান্য দুর্বল হওয়া শর্ত, অথচ আলোচ্য হাদীসটিকে হাফেয ইবনে হজর (রহ.) 'মুনকার' বলেছেন, কেউ কেউ 'যঈফে শাদীদ' তথা বেশি দুর্বল বলেছেন। এর জবাবে আমরা বলব, অনেক মুহাদ্দিস তো হাদীসটি 'হাসান' পর্যন্ত বলেছেন, তা সত্ত্বেও কিভাবে একে বেশি দুর্বল বলে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করব? মতবিরোধের কারণে এতে শিথিলতা অবশ্যই মানতেই হবে। তা ছাড়া অনেক মুহাদ্দিস এমনও রয়েছেন, যাঁরা ফাজায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে 'শাদীদ' না হওয়ার শর্ত করেন না, বরং কেবলমাত্র মওযূ না হলেই আমলযোগ্য বলেছেন, চাই তা 'যঈফে ইয়াসীর' হোক বা 'শাদীদ' হোক। নিম্নে আমরা আলোচনার দীর্ঘতার ভয়ে এ সম্বন্ধে কেবল দুজন প্রতিথযশা মুহাদ্দিসের উক্তি উল্লেখ করব।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم :يجوز ويُستحب العمل فى

الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا

অর্থাৎ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বলেন, ফাজায়েল ও তারগীব-তারহীবের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা বৈধ ও মুস্তাহাব, যতক্ষণ না তা মওযূ তথা জাল না হয়। (আল আযকার, নববী, পৃ. ৪৭)

প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.) হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর'-এর ইকামত অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক বলেন,

وإلا فالضعيف غير الموضوع يعمل به فى فضائل الأعمال

অর্থাৎ, কোনো হাদীস মওযূ তথা জাল না হয়ে শুধু যঈফ হলে ফজীলতের ক্ষেত্রে তা আমলযোগ্য। (ফাতহুল কাদীর ১/৩৪৯)

তিনি উক্ত কিতাবের জানাযা অধ্যায়ে আরো বলেন,

والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع

অর্থাৎ, মওযূ তথা জাল না হয়ে শুধু যঈফহাদীস হলেও তা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে। (ফাতহুল কাদীর ২/১৩৩)

যুগে যুগে হাদীসটি অনুসৃত হয়ে আসছে

এ তো গেল হাদীসের সনদের মানবিষয়ক আলোচনা। হাদীসটি সূত্রগতভাবে নির্ভরযোগ্য না মানলেও তা আমলযোগ্য। কেননা যুগে যুগে হক্কানী আলেমগণ হাদীসটি কবুল করেছেন, কেউ হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে গ্রহণযোগ্য বলেছেন, কেউ তা দিয়ে কিতাবে দলিল দিয়েছেন, কেউ আমলের জন্য উৎসাহিত করেছেন, এভাবেই যুগে যুগে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে আসছে। আর হাদীস বিশারদগণের স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হলো, সূত্রের বিচারে একটি দুর্বল হাদীস যুগে যুগে তার ওপর উম্মতের আমল হয়ে এলে 'হাসান' পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আব্দিল বার (রহ.) বলেন,

وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندى صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به

অর্থ : এ ধরনের সনদে মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রহণযোগ্য বলেন না, তবে আমার নিকট তা সহীহ, কেননা নির্ভরযোগ্য আলেমগণ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন এবং তদানুযায়ী আমল করেছেন। (আত্তামহীদ ১৬/২১৮)

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন,

ومما يصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه

অর্থ : হাদীস সহীহ হওয়ার মূলনীতিগুলোর একটি নীতি হলো, নির্ভরযোগ্য আলেমগণ ওই হাদীস অনুযায়ী আমল করা। (ফাতহুল কাদীর ৩/৪৩৯)

উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, এটি একটি 'হাসান' পর্যায়ের গ্রহণযোগ্য হাদীস। কেননা সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে জুমু'আর দিন অধিক পরিমাণে দরূদ পড়ার গুরুত্ব ও ফজীলত প্রমাণিত এবং জুমু'আর দিন আসরের পরের সময়টি দু'আ কবুলের গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর হাদীসের শব্দে সামান্য পার্থক্যে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পরস্পরে সমর্থনকারী। এ ছাড়া সার্বিক বিবেচনায় হাদীসটি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর ইমাম গাযযালী, সপ্তম শতাব্দীর শায়খ আবু আব্দিল্লাহ ইবনে নোমান, অষ্টম শতাব্দীর হাফেয ইরাকি, নবম শতাব্দীর হাফেয সাখাবী ও হাফেয সুয়ূতি, দশম শতাব্দীর আল্লামা ইবনে হজর মক্কী ও মোল্লা আলী কারী এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য হাদীস হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তা দ্বারা দলিল দিয়েছেন। এ হাদীস অনুসারে আমলের প্রতি উৎসাহিত করেছেন হাদীসের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনকারী ষষ্ঠ শতাব্দীর বিদগ্ধ মুহাদ্দিস হাফেয ইবনুল জাওযি (রহ.)ও। (দেখুন : ইহয়াউল উলূম, ইমাম গাযযালী ১/১৮৬, ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, শাইখুল হাদীস যাকারিয়া পৃ. ৫৬, আদ্দুররুল মানযূদ, ইবনে হজর মক্কী পৃষ্ঠা : ২১২, বুস্তানুল ওয়ায়েযীন, ইবনুল জাওযি, পৃ. ২৯৮)

দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া :

সাখাবী (রহ.)-এর উল্লিখিত ৮০ বার দরূদ শরীফের হাদীসটির ওপর আমল করা যাবে কি না–এ প্রশ্নের উত্তরে দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া হলো, "হাদীসটির ওপর আমল করা যাবে, তবে এর সনদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও যেহেতু ফাজায়েলের হাদীস, তাই আমল করা যাবে।" নিম্নে দারুল উলূম দেওবন্দের মূল উর্দু ফাতওয়াটি উল্লেখ করা হলো :

کیا اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ۸۰ مرتبہ درج ذیل درود پڑھے گا تو اللہ تعالی اسی ۸۰ سال کے گناہ معاف کردیں گے اور اسی سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا درود یہ ہے۔ اللھم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسیما

Published on: Nov 26, 2014

جواب # 56606

بسم الله الرحمن الرحيم

Fatwa ID: 80-77/D=2/1436-U

جی ہاں، اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے اس میں کچھ ضعف ہے، مگر فضائل کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دارالافتاء،

دارالعلوم دیوبند

সূত্র : http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Hadith--Sunnah/56606

‘তালাকে তাফইজ’

(স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রদান)

মুফতী শরীফুল আজম

শরীয়ত কর্তৃক তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাতে প্রদান করা হয়েছে। স্বামী তালাক না দিলে স্ত্রী নিজ থেকে বিবাহ ভাঙার অধিকার রাখে না। তবে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। এ ধরনের ক্ষমতাপ্রাপ্তা হলে স্ত্রী নিজ নফসের ওপর তালাক কার্যকর করতে পারে। তবে স্বামীকে তালাক প্রদান করতে পারে না। ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি শর্তযুক্ত হতে পারে বা নিঃশর্ত হতে পারে। তালাকে তাফইজ প্রয়োগ এবং কার্যকর হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিধিবিধান পালন আবশ্যক, অন্যথায় বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না।

শাব্দিক অর্থ :

তাফইজ বা তাফবীজ মূলত আরবী শব্দ تـفويض থেকে এসেছে। এর অর্থ অর্পণ করা। কারো হাতে কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া। তালাকের ক্ষেত্রে তাফইজ বলতে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ বোঝায়। তাফইজ শব্দের সমার্থক আরো কিছু শব্দ রয়েছে। যেমন التـــوكيـــل তাওকীলঃ উকিল বানানো। التـــمـــليك তামলিকঃ মালিক বানানো। التـــخييـــر তাখ্ইরঃ এখতিয়ার প্রদান। অর্থাৎ স্বামীর সংসারে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার।

শানে নূযূল :

স্ত্রীকে তালাকের এখতিয়ার প্রদানের বিধান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এসংক্রান্ত আয়াতটি তাখ্ইরের আয়াত নামে প্রসিদ্ধ। মূলত নবীজি (সা.)-এর পবিত্র জীবনের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনিচ্ছাকৃত একটি ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বিশিষ্ট মুফাস্সির আবু হাইয়্যান কৃত তাফসীরে বাহরে মুহিতে ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে যে আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর ও বনু-কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) ভাবলেন যে মহানবী (সা.) হয়তো এসব গনীমতের মাল থেকে নিজের প্রাপ্ত অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানিপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা.) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে তাঁরা এত দিনের সংস্বর্গ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজি (সা.) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। যদিও তা জরুরতের অতিরিক্ত ছিল না। তথাপি স্ত্রীদের এমন দাওয়া-দাবি নবীজি (সা.)-এর মনোকষ্টের কারণ হয়। ফলে তিনি এক মাস স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার সংকল্প করেন। নবীজি (সা.)-এর বিবাহে তখন চারজন স্ত্রী ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.), হযরত হাফসা (রা.), হযরত উম্মে সালমা (রা.) ও হযরত সাউদা (রা.)। স্ত্রীদের গৃহ ত্যাগ করে নবীজি (সা.) খেজুরগাছের উচ্চতায় টংজাতীয় মাচা পেতে সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পুণ্যবতী স্ত্রীদের উদ্দেশে আয়াত অবতীর্ণ হয়, يـا ايها النبى قل لازواجك الـخ হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আল আহযাব-২৮-২৯)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসংক্রান্ত দীর্ঘ এক হাদীসে এসেছে,

وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ :دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ : فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا، قَالَ :فَقَالَ :لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ :هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ

إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلاَهُمَا يَقُولُ : تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ :وَاللهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا -أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ -ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ) (الأحزاب٢٨ :) حَتَّى بَلَغَ (لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) (الأحزاب٢٩ :)، قَالَ :فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ :يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ :وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ، قَالَتْ :أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ، قَالَ :لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا، وَلاَ مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا

"হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা.) এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থিতির অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর আবু বকর (রা.)-কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর (রা.) এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চিন্তাযুক্ত ও নীরব বসে থাকতে দেখলেন। চারপাশে তাঁর সহধর্মিণীগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি [বর্ণনাকারী জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.)] বলেন, উমর (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এমন কথা বলব, যা তাঁকে হাসাবে। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি দেখতেন খারিজার কন্যা [উমর (রা.)-এর স্ত্রী] আমার কাছে খোরপোষ তলব করেছিল। আমি তার দিকে উঠে গেলাম এবং তার ঘাড়ে ঘুসি মারলাম। তখন রাসূল (সা.) হেসে উঠলেন এবং বললেন, আমার চারপাশে তোমরা যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার কাছে খোরপোষ দাবি করছে। অমনি আবু বকর (রা.) আয়েশা (রা.)-এর দিকে ছুটলেন এবং তাঁর গর্দানে ঘুসি মারলেন। উমর (রা.)ও দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাফসা (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর ঘাড়ে ঘুসি মারলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন জিনিস দাবি করছ, যা তাঁর কাছে নেই। তখন তাঁরা [নবী (সা.)-এর সহধর্মিণীগণ] বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এমন জিনিস চাইব না, যা তাঁর কাছে নেই। এরপর তিনি তাঁদের (তাঁর সহধর্মিণীগণের) থেকে এক মাস কিংবা ২৯ দিন পৃথক রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রতি এই আয়াত নাজিল হলো : (অর্থ) "হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণা, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব-২৮-২৯)। জাবির (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আয়েশা (রা.)-কে দিয়ে আয়াতের নির্দেশ তামীল করতে শুরু করলেন। বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করতে চাই। তবে সে বিষয়ে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমার ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই আমি পছন্দ করি। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বিষয়টা কি আমি জানতে পারি? তখন তিনি তাঁর সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমি কি আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাব? (এর কোনো প্রয়োজন নেই)। না, বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতকেই বেছে নিয়েছি। তবে আপনার সকাশে আমার একান্ত নিবেদন, আমি যা বলেছি তা আপনি আপনার অন্য সহধর্মিণীগণের কারো কাছে ব্যক্ত করবেন না। তিনি বললেন, তাঁদের যে কেউ সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি অবশ্যই তাঁকে তা বলে দেব। কারণ আল্লাহ আমাকে কঠোরতা আরোপকারী ও হঠকারীরূপে নয়, বরং সহজ পন্থায় (শিক্ষাদানকারী) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। (মুসলিম শরীফ বাংলা ৩য় খণ্ড : পৃ. ৪৩৫-৪৩৭, হাদীস নং-৩৫৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনূদিত)। একে একে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীকে এই এখতিয়ার দেওয়া হলো। সবাই পার্থিব সুযোগ-সুবিধার চেয়ে নবীজি (সা.)-এর সহধর্মিণী হিসেবে থাকাকে পছন্দ করে নেন।

প্রয়োজনীয়তা :

যদিও তালাকের ক্ষমতা মূলত স্বামীর সে চাইলে হবে নতুবা হবে না। কিন্তু স্ত্রীর হাতে এই ক্ষমতা অর্পণের বিভিন্ন পরিস্থিতি হতে পারে বিধায় শরীয়তে এই সুযোগও রাখা হয়েছে। স্বামী অনেক সময় তালাককে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট ভেবে বসে থাকে অথচ দাম্পত্য সম্পর্কে অচলাবস্থা বিরাজ করতে থাকে। তালাকের দায়ভার, বদনাম বা কলঙ্ক সে বহন করতে চায় না। ফলে একজন

নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে স্বামী নিজে তালাক না দিয়ে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে দিলে বেচারি নতুন জীবনের মুখ দেখার সুযোগ পেতে পারে। তাই শরীয়তে তালাকে তাফইজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীর কাছে এমন আবদার করে বসে, যা তার সাধ্যাতীত। স্ত্রীকে বোঝাতে না পারলে অপারগ হয়ে তাকে তালাকের এখতিয়ার দিয়ে সংশোধন করতে চায়। আমি এর চেয়ে বেশি আর পারব না, তোমার ভালো লাগলে থাকো নয়তো অভিভাবকদের সাথে বুঝে পৃথক হয়ে যাওয়ার চিন্তা করো।

অনেক সময় স্ত্রীর কোনো অন্যায় আচরণ বা চারিত্রিক ত্রুটি স্বামী বরদাশত করতে পারে না। সংশোধন চায় কিন্তু তালাক চায় না। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দিয়ে সতর্ক করা যেতে পারে। এতে স্ত্রী হয়তো স্বামীর বাধ্য হবে অথবা ক্ষমতা পেয়ে তালাক নিয়ে চলে যাবে। স্বামীও পরিত্রাণ পাবে বিভিন্ন ঝামেলা থেকে। অনেক সময় স্বামী আইনি জটিলতা বা নারী নির্যাতনের মামলার ভয়ে নিজ থেকে তালাক দিতে চায় না আবার সংসারও ঠিকমতো করে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হলে স্বামীর ভয়ও দূর হবে এবং স্ত্রীর পথও পরিষ্কার হবে।

সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে অনেক সময় মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় মানুষ ভরসা পায় না। নতুন সংসারে গিয়ে মেয়ে সুখী হবে কি না–এ নিয়ে সংশয় কাজ করে। নতুন জামাই কেমন হবে, তার চরিত্র কী? এ ধরনের নানা প্রশ্ন পেরেশান করে থাকে। তাই কনেপক্ষ বিয়ের মজলিসেই তালাকের ক্ষমতা চায়। এ ধরনের সংকট নিরসনে শরীয়তে রয়েছে তাফইজের বিধান। অনেক সময় স্বামী বিদেশ গিয়ে আর ফিরে আসে না, কোনো যোগাযোগও রাখে না বা দেশে থাকলেও আত্মগোপন করে স্ত্রীকে এড়িয়ে চলে–এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রী ক্ষমতাপ্রাপ্তা হলে তালাক গ্রহণ করে নিজের পথ দেখার সুযোগ পেতে পারে।

অনেক সময় স্বামী তিন তালাক প্রদান করা সত্ত্বেও বলে দুই তালাক দিয়েছি। অথচ স্ত্রী নিজ কানে তিন তালাক শুনেছে। এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত তবে অন্য কোনো সাক্ষী তার কাছে নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে, যেকোনো পন্থায় ওই স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্বেচ্ছায় জেনেশুনে ওই স্বামীর সংসার করা তার জন্য বৈধ হবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্ত্রীর কাছে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে তা প্রয়োগ করে সে পরিত্রাণ পেতে পারে।

মোটকথা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তালাকে তাফইজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ করে ইসলামে এর বিধান রাখা হয়েছে। যাতে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে ইদ্দত পালন শেষে ইচ্ছা হলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি :

স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ দ্ব্যর্থহীন শব্দে হতে পারে আবার দ্ব্যর্থক শব্দেও হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে صريح সরীহ আর দ্বিতীয়টি كناية কেনায়া। দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ যেমন طلقي نفسك ان شئت তুমি চাইলে নিজেকে তালাক প্রদান করতে পারো। দ্ব্যর্থক উচ্চারণ যেমন امرك بيدك অথবা اختاري نفسك অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্ত তোমার হাতে বা তোমার নিজের নফসের ব্যাপারে এখতিয়ার আছে। এ ধরনের অন্য কোনো শব্দেও ক্ষমতা অর্পণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো স্বামী যে শব্দে নিজে তালাক দিতে পারে অনুরূপ শব্দে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে। শব্দটি তালাক বা দ্ব্যর্থহীন অন্য কোনো শব্দ হলে تفويض তাফইজে صريح তাফইজে সরীহ হবে অন্যথায় تفويض كناية তাফইজে কেনায়া হবে।

باب تفويض الطلاق : اى تفويضه للزوجة او غيرها صريحا كان التفويض او كناية يقال فوض له الامر اى رده اليه حموى۔ فالكناية قوله اختارى او امرك بيدك، والصريح قوله طلقى نفسك ابو سعود (رد المحتار ٣/٣١٤)

اما التفويض فنحو قول الرجل لامرأته : امرك بيدك وقوله اختارى وقوله انت طالق ان شئت وما يجرى مجراه وقوله طلقى نفسك (بدئع الصنائع ٤/٢٤٧)

الفاظ التفويض فى الطلاق: ذهب جمهور الفقهاء الى تقسيم الفاظ التفويض فى الطلاق الى صريح وكناية فالصريح عندهم ماكان بلفظ الطلاق كطلقى نفسك ان شئت والكناية ما كان بغيره كاختار ى نفسك وامرك بيدك (الموسوعة الفقهية ١٣/١١١)

ক্ষমতা প্রয়োগ পদ্ধতি :

তালাক কার্যকর করতে হলে তালাকের ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। স্ত্রী যদি প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করে তবে তালাক হবে না। স্বামী নিজে তালাক দিলে যে শব্দ ব্যবহার করে থাকে স্ত্রী অনুরূপ শব্দে তালাক গ্রহণ করতে হবে। আর যে শব্দে স্বামীর তালাক কার্যকর হয় না তা স্ত্রীর বেলায় কার্যকারিতা রাখে না। যেমন–স্ত্রী যদি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বলে, আমার নফসকে তালাক দিলাম/আমার নফসকে হারাম করলাম/নিজেকে বায়েন দিলাম/আমি তোমার জন্য হারাম ইত্যাদি তবে তালাক হয়ে যাবে। কেননা স্বামী যদি স্ত্রীকে এভাবে বলত–তোমার নফসকে তালাক দিলাম/হারাম করলাম/বায়েন দিলাম/তুমি আমার জন্য হারাম তবে এর দ্বারা তালাক হয়ে যেত। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বামীকে বলে, তুমি আমার থেকে তালাক তবে তালাক কার্যকর হবে না। কেননা স্বামী যদি এভাবে বলত, আমি তোমার থেকে তালাক তবে এতে তালাক কার্যকর হতো না।

الى نفسه لم يقع (رد المحتار ٣/٣٢٦)
فلوقالت انا طالق او طلقت نفسى وقع بخلاف نحو طلقتكَ لان المرأة توصف بالطلاق دون الرجل (الدر المختار ١/٢٢١)
رجل جعل امرأته بيدها فى الطلاق فقالت لزوجها طلقتكَ كان باطلا كما لو اضاف الزوج الطلاق الى نفسه (الهندية ١/٣٥١)
لابد من ذكر النفس او التطليقة او الاختيارة فى احد الكلامين لوقوع الطلاق (الهندية ١/٣٨٨)

মজলিসের সীমাবদ্ধতা :

স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হলে ওই মজলিসেই তাকে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। মজলিস শেষ হয়ে গেলে আর ক্ষমতা বাকি থাকবে না। তবে যদি ক্ষমতা অর্পণের সময় বলা হয় 'যখন ইচ্ছা তখনই তালাক গ্রহণ করতে পারবে' তাহলে মজলিসের পরও ওই ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে। ক্ষমতাটি যদি কোনো শর্তযুক্ত হয় তবে শর্ত পাওয়া গেলে তবেই ক্ষমতাপ্রাপ্তা হবে, অন্যথায় নয়। শর্ত পাওয়া গেলে সাথে সাথে ওই মজলিসেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মজলিসের পর তালাক গ্রহণ করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি শর্ত পাওয়ার পর যেকোনো সময় তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ উদ্দেশ্য হয় তবে মজলিসের পরও তালাক গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে।

বর্তমান প্রচলিত কাবিননামায় তালাকের ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা যেহেতু যখন ইচ্ছা তখন ক্ষমতা প্রয়োগই উরফে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাই কাবিননামার ১৮ নং কলামের ক্ষমতাবলে যেকোনো সময় তালাক গ্রহণ করার অবকাশ আছে। শর্তযুক্ত ক্ষমতা হলে শর্ত পাওয়ার পর যেকোনো সময় তালাক গ্রহণ করতে পারবে। মজলিসের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তবে এই ক্ষমতা একবারই প্রয়োগ করতে পারবে, বারবার নয়।

قال لها طلقى نفسك تقيد بالمجلس فالاصل فيه ان كل ما يصلح من الالفاظ طلاقا من الزوج يصلح جوابا من المرأة وما لا فلا ---
اذا عرفت هذا فنقول: اذا قالت: طلقت نفسى او ابنت نفسى او حرمت نفسى يكون جوابا لان الزوج لواتى بهذه الالفاظ كان طلاقا ---
ولو قالت لزوجها: انت منى طالق لم يكن جوابا لان الزوج لو قال لها : انا منك طالق لم يكن طلاقا عندنا ، خلافا للشافعى (بدائع الصنائع ٤/٢٥٦)

উল্লিখিত মূলনীতির ব্যতিক্রম শুধু একটি শব্দ আর তা হচ্ছে اختيار এখতিয়ার। উক্ত শব্দে তালাক প্রয়োগ স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব। স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণের ক্ষমতা পেয়ে বলে আমি নিজ নফসকে এখতিয়ার করলাম তাহলে তালাক হয়ে যাবে।

الا فى لفظ الاختيار خاصة فانه لايصح طلاقا من الزوج ويصلح جوابا من المرأة فى الجملة بخلاف الاصل---
ولو قالت اخترت نفسى كان جوابا وان لم يكن هذا اللفظ من الزوج طلاقا وانه حكم ثبت شرعا بخلاف القياس بالنص واجماع الصحابة (بدائع الصنائع ٤/٢٥٧)

কাবিননামায় তালাকের ক্ষমতা :

আমাদের দেশে প্রচলিত কাবিননামার ১৮ নং কলামে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের সুযোগ রাখা হয়েছে। উক্ত কলামে লেখা থাকে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না? করিয়া থাকিলে কী কী শর্তে? এই ঘরটি অনেকে হাতে পূরণ করে আবার অনেক কাজি অফিসে সিল বানানোই থাকে, শুধু সিল বসিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষমতা অর্পণের এ বিষয়টি যদিও বাধ্যতামূলক নয় বরং একটি অপশন মাত্র। কিন্তু খুব কমসংখ্যক লোকই সেখানে 'না অর্পণ করি নাই' লিখতে সক্ষম হয়। কাজেই এটা এক প্রকার বাধ্যতামূলক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন শব্দে এই ক্ষমতা অর্পণ করতে দেখা যায়। যেমন হ্যাঁ অর্পণ করিয়াছে/হ্যাঁ অর্পণ করিয়াছে বনিবনা না হইলে, খোরপোষ না দিলে, নিরুদ্দেশ হইলে/ হ্যাঁ অর্পণ করিয়াছে বনিবনা না হইলে যখন ইচ্ছা তখন ইত্যাদি। ১৮ নং কলামটি পূরণ করতে গিয়ে যে শব্দেই ক্ষমতা অর্পণ করা হোক না কেন এটা তাফবিজে তাফইজে সরীহ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা ওই কলামে তালাক শব্দটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে-তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে কি না? আর তাফইজের ক্ষেত্রে তালাক শব্দ ব্যবহৃত হলে তা صريح সরীহ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

والمفيد للبينونة اذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه (الدر المختار مع الرد ٣/٣٢٣)

কাবিননামায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে স্ত্রী তালাক গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলে লিখে বা মৌখিক বলতে হবে যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিলাম/তালাক গ্রহণ করিলাম/নিজ নফসের ওপর তালাক প্রদান করিলাম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে অসতর্কতাবশত অনেকে এমন সব কথা লেখে, যার দ্বারা তালাক কার্যকর হয় না। যেমন স্বামীকে তালাক প্রদান করিলাম/স্বামীকে তালাক দিয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিলাম ইত্যাদি। এখানে স্বামীকে তালাক প্রদানের কথা লেখা হয়েছে অথচ স্বামী তালাকের পাত্র নয়। যেমন স্বামী যদি বলে নিজের নফসের ওপর তালাক প্রদান করিলাম/আমাকে তালাক দিলাম তবে এর দ্বারা তালাক হবে না। তালাকের পাত্র হচ্ছে স্ত্রী বিধায় তালাক স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া হলে যেভাবে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে দিতে হবে তদ্রূপ স্ত্রী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে নিজের ওপর তালাক গ্রহণ করতে হবে, স্বামীকে তালাক দিলে হবে না।

وكذا قولها انا طالق او طلقت نفسى اسندت الطلاق الى نفسها فيصح جوابا لانه لو اسند الطلاق اليها يقع بخلاف قولها طلقتكَ ومثله قولها انتَ منى طالق لانها اسندت الطلاق اليه وهو لو اسنده

কাবিনের শর্ত উল্লেখ করা হয় না। এটা মারাত্মক একটি ভুল। কবুল পড়ানোর আগে কাবিন বা তালাকের ক্ষমতা অর্পণ গ্রহণযোগ্য নয়। এর দ্বারা তাফইজ সহীহ হবে না। তাই এমন তাফইজের ভিত্তিতে পরবর্তীতে তালাক গ্রহণ ও বৈধ হবে না।

الطلاق والتفويض قبل النكاح لا يصح (فتاوى قاضي خان ١/١٥٥)

اگر نکاح سے قبل یہ تحریر لکھوائی کہ تمہاری بیوی کو طلاق دینے کا مجھ کو اختیار ہے تو یہ تحریر غیر موثر ہے اس تحریر کو نان ونفقہ کی عدم ادائیگی پر معلق کرے یا نہ کرے سب بیکار ہے (فتاوی محمودیہ ۱۱/ ۲۱۸)

نکاح سے پہلے تفویض طلاق نہیں ہوسکتی (فتاوی دارالعلوم ۱۰/ ۳۷)

پہلی صورت کہ یہ کابین نامہ نکاح سے پہلے لکھا جاوے اس کے معتبر ومفید ہونے کیلئے یہ شرط ہے کہ اس میں نکاح کی طرف اضافت ونسبت موجود ہو۔۔۔ اگر اس میں اضافت الی النکاح نہ لکھی گئی تو اقرار نامہ محض بیکار ہوگا اسکی رو سے عورت کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔ (حیلہ ناجزہ ۲۰)

খালি ফরমে দস্তখত :

অনেক সময় দেখা যায় কাবিননামার সকল ঘর পূরণ না করে স্বামীর দস্তখত নেওয়া হয়। বিশেষ করে ১৮ নং কলামটি খালি থাকা অবস্থায় দস্তখত নিয়ে পরে কাজি সাহেব নিজের পক্ষ থকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের কথা লিখে দেন। অথবা বিশেষ সিলমোহর লাগিয়ে ঘরটি পূরণ করে দেন। বিয়ের মজলিসে তাড়াহুড়ার কারণে বা লেখার ভুলভ্রান্তি এড়াতে সাধারণত এমনটি করা হয়ে থাকে। একটি রাফ খাতায় কাজি সাহেব বর-কনের যাবতীয় তথ্য লিখে নেন এবং পরে অফিসে গিয়ে তা মূল রেজিস্টারে উঠিয়ে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে যে বিষয়টি আপত্তিকর তা হচ্ছে ১৮ নং কলাম খালি

ئی صورت موافقت کی نہ ہو اور حقوق طرفین ادا نہ کرسکتی ہو تو عورت طلاق طلب کرسکتی ہے (فتاوی دارالعلوم ۹/۳۳)

তালাকের ক্ষমতা প্রত্যাহার :

স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের পর স্বামী ওই ক্ষমতা আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না বা স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারবে না। বিষয়টি এখন শুধুই স্ত্রীর এখতিয়ারে থাকবে। সে চাইলে তালাক হবে নতুবা হবে না। কিংবা সে চাইলে স্বামীকে ক্ষমতা ফেরত দিতে পারবে। আর যদি স্বামী যখন ইচ্ছা তখন তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে থাকে তবে ক্ষমতা ফেরত দিলেও তা ধর্তব্য হবে না। বরং স্ত্রী চাইলে আবার তালাক গ্রহণ করতে পারবে।

واما بيان صفته فهو انه لازم من جانب الزوج حتى لايملك الرجوع عنه ولا نهى المرأة عما جعل اليها ولا فسخ ذلك لانه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك ابطاله بالرجوع والنهى والفسخ (بدائع ٤/٢٤٨)

ولو قالت : اخترتك او قالت لا اختار الطلاق خرج الامر من يدها لانها صرحت برد التمليك وانه يبطل بدلالة الرد فبالصريح اولى (بدائع الصنائع ٤/٢٥١)

فاما اذا كان موقتا فان اطلق الوقت بان قال امرك بيدك اذا شئت۔۔۔ فلها الخيار فى المجلس وغير المجلس ولا يتقيد بالمجلس حتى لوردت الامر لم يكن ردا (بدائع الصنائع ٤/٢٥١)

বিয়ের পূর্বে তাফইজ :

আমাদের দেশে একটি ভুল প্রথা আছে। বিয়ের আগের দিন কাজি অফিসে গিয়ে কাবিন করা হয়, অথবা বিয়ের দিন কবুল পড়ানোর আগে কাবিননামা পূরণ করে স্বামীর দস্তখত নেওয়া হয়। সেখানে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের কথা লিখে দেওয়া হয়। এরপর নিয়মতান্ত্রিক কবুল পড়ানো হয়। অথচ তখন

لانه تمليك الا اذا زاد متى شئت ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا (الدر المختار ١/٢٢٨)

وان قال طلقى نفسك متى شئت فلها ان تطلق نفسها فى المجلس وبعده لان كلمة متى عامة فى الاوقات كلها فصار كما اذا قال فى اى وقت شئت (هداية ٢/٣١١)

والعرف فى الشرع له اعتبار☆ لذا عليه الحكم قد يدار (رد المحتار ٥/٨٨)

الا لا تملك ان تطلق نفسها الا مرة واحدة (بدائع ٤/٢٥٢)

বনিবনা না হওয়া :

শর্ত সাপেক্ষে তালাকের ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে অনেক সময় লেখা হয় বনিবনা না হলে তালাক গ্রহণ করতে পারে। এই বনিবনার সঠিক ব্যাখ্যা আসলে কী? যেকোনো ঠুনকো অজুহাতে অনেক সময় স্ত্রী বনিবনা না হওয়ার দাবি করে তালাকে তাফইজ দিয়ে থাকে, অথচ শর্তটি যথাযথভাবে পাওয়া না গেলে তালাক কার্যকর হবে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে বনিবনার সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে স্ত্রীর খোরপোষ, বাসস্থানসহ শরীয়ত নির্ধারিত যাবতীয় অধিকার কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া আদায় না করায় সৃষ্ট পারিবারিক কলহ। স্ত্রী এমন কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে বনিবনা হচ্ছে না বলে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। শুধুমাত্র মনের ভালো লাগা না লাগার ভিত্তিতে বনিবনা হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হবে না।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (بقرة ٢٢٩)

الا ان يخافا الزوجان الا يقيما حدود الله اى ان لايراعيا مواجب احكام الزوجية (تفسير ابى السعود ١/٢٢٦)

حدود الله اى فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة (تفسير قرطبى ٣/١٣٨)

الجواب: اگر باہم زوجین میں نا اتفاقی ہو اور کو

রেখে স্বামীর দস্তখত আদায়। কাজি সাহেব দস্তখত নেওয়ার পর নিজের পক্ষ থেকে ওই কলাম পূরণ করে দিলে ক্ষমতা অর্পণ শুদ্ধ হবে না। ফলে এই ক্ষমতাবলে পরবর্তীতে স্ত্রী তালাক গ্রহণ করে অন্যত্র বিবাহ বসাও বৈধ হবে না। আজীবন তাকে গোনাহে লিপ্ত থাকতে হতে পারে। বিষয়টির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يملله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (رد المحتار ٣/٢٤٧)

سادہ کاغذ پر شوہر کا دستخط لے لیا اور اسکے علم کے بغیر اس کی بیوی کیلئے طلاق نامہ لکھوا دیا تو کیا حکم ہے؟ الجواب: اس صورت میں زید کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی (فتاوی دار العلوم ۹/۱۵۲)

না জেনে না বুঝে তাফইজ :

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ মানুষ কাবিননামার ১৮ নং কলামের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে একেবারেই ধারণা রাখে না। কাজি সাহেব কাবিননামা পূরণ করে দেন এবং তালাকের ক্ষমতাও অর্পণের কথা লিখে দেন। বরকে শুধু দস্তখতের জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয় আর সে দস্তখত করে ফেলে। পরবর্তীতে কখনো তাফইজের আলোচনা উঠলে সে বলে– আমি তো ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি না জেনে না বুঝে দস্তখত করেছি। অতএব তালাক মানি না। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর এমন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। তালাক অথবা তাফইজ ইত্যাদি শরয়ী হুকুমের কার্যকারিতার ব্যাপারে অজ্ঞতা উজর হিসেবে বিবেচিত হয় না। কাবিননামার ১৮ নং ধারাটি আইনসিদ্ধ এবং স্পষ্ট। এই ঘরে ক্ষমতা অর্পণের কথা লেখা থাকাবস্থায় দস্তখত দিলে তা কার্যকর হয়ে যাবে। উজর চলবে না। তা ছাড়া কাজি সাহেবকে যেহেতু কাবিননামার ঘরগুলো পূরণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তার ওপর আস্থা রেখে দস্তখত করা হয়েছে তাই সেখানে লিপিবদ্ধ সকল বিষয়ের দায়-দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে।

اذا لا عذر بالجهل بالاحكام فى دار الاسلام (رد المحتار ١/٩٢٥٧

ولم يشترط بالخيار لانه تتفرغ لمعرفة احكام الشرع والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل (هداية ٢/٢٩٧)

لم تعذر بالجهل بالخيار لانها تتفرغ لمعرفة احكام الشرع والدار دار العلم (عناية ٣/١٧٧)

والعرف فى الشرع له اعتبار ☆ لذا عليه الحكم قد يدار (رد المحتار ٥/٨٨)

وحاصله ان ذلك ان صرح باشتراط لزم تسليمه وكذا ان سكت عنه وكان العرف به مشهورا معلوما عند الزوج (رد المحتار ٣/١٣١)

جہل احکام شرع میں عذر نہیں (امداد الفتاوی ۲/۳۹۱)

তাফইজ নিয়ে মতানৈক্য :

অনেক সময় স্বামী দাবি করে আমি তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিনি। ১৮ নং কলাম খালি রেখে দস্তখত করেছিলাম। কাজি সাহেব নিজ থেকে তা পূরণ করেছেন। অতএব স্ত্রী তালাক গ্রহণের ক্ষমতা রাখে না। আর স্ত্রী বলে ক্ষমতা যথানিয়মেই অর্পণ করা হয়েছে এবং সে তালাক গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। এমতাবস্থায় শরীয়তের ফয়সালা হচ্ছে স্বামীর কাছে তার দাবির পক্ষে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী তলব করা হবে। যেহেতু এখানে সে مدعى তথা বাদী। সাক্ষী পেশ করতে অপারগ হলে স্ত্রীর কাছ থেকে তখন কসম নেওয়া হবে যেহেতু সে مدعى عليه তথা বিবাদী। যদি সে কসম করে বলতে পারে যে যথানিয়মে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে তাফইজ সহীহ বলে গণ্য হবে। তবে মিথ্যা কসম খেলে সে গোনাহগার হবে।

البينة للمدعى واليمين على من انكر (قواعد الفقه ٦٦)

عورت کہتی ہے کہ شوہر نے طلاق دی ہے----

তাফইজের কার্যকারিতা :

স্ত্রী তালাকে তাফইজ গ্রহণ করলে কয় তালাক হবে তা নির্ভর করে ক্ষমতা অর্পণের ধরনের ওপর। দ্ব্যর্থবোধক কেনায়া শব্দে ক্ষমতা অর্পণ হয়ে থাকলে এবং সংখ্যার কোনোরূপ নিয়্যাত না থাকলে এর দ্বারা একটি বায়েন তালাক কার্যকর হবে। যেমন তোমাকে এখতিয়ার দিলাম/তোমার সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারো ইত্যাদি। আর যদি দ্ব্যর্থহীন সরীহ শব্দে ক্ষমতা দেওয়া হয়, যেমন তোমাকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করলাম/তালাকের এখতিয়ার দিলাম ইত্যাদি। তবে এর দ্বারা কোনো সংখ্যার নিয়্যাত না থাকলে প্রত্যাহারযোগ্য এক তালাক কার্যকর হবে। আর তিন তালাকের নিয়্যাত করে থাকলে তিন তালাক হবে। দুই তালাকের নিয়্যাতে এক তালাকই হবে।

اما الواقع بهذه الالفاظ التى تصلح جوابا فطلاق بائن عندنا ان كان التفويض مطلقا عن قرينة الطلاق بان قال لها: امرك بيدك ولم ينو الثلاث ---- ولو قال امرك بيدك ونوى الثلاث فطلقت نفسها ثلاثا كان ثلاثالانه جعل امرها بيدها مطلقا فيحتمل الواحد ويحتمل الثلاث فاذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله مطلق الامر فصحت نيته وان نوى اثنتين فهى واحدة عند اصحابنا الثلاث خلافا لزفر (بدائع الصنائع ٤/٢٥٧)

لوقال لها طلق نفسك فقالت فى جوابه انت نفسى طلقت رجعية --- قال لها طلقى نفسك ولم ينو او نوى واحدة او اثنتين فى الحرة فطلقت وقعت رجعية وان طلقت ثلاثا ونواه وقعن (رد المحتار ٣/٣٣١)

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-১১

মাওলানা কাসেম শরীফ

*(**কৈফিয়ত :** মাসিক আল-আবরারের গত সংখ্যায় কথা দিয়েছিলাম যে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ুয়াদের নৈতিক অধঃপতন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিষয়টা নিয়ে আমার মোটেও কোনো উৎসাহ নেই। গালাগালি, ছিদ্রান্বেষণ ও কাউকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার পরও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সংখ্যায় এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করব। একান্তভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনার তাগিদে, কওমী মাদ্রাসার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও আদর্শিক উৎকর্ষতা বোঝানোর জন্যই এ আলোচনা আমাকে করতে হচ্ছে। সভ্য, ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল পাঠকের কাছে এই সীমাবদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার কারণে ক্ষমাপ্রার্থী।)*

সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ুয়াদের নৈতিক অধঃপতন :

প্রেম, প্রণয়, ফ্রি সেক্স, লিভ টুগেদারের পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় পড়ুয়াদের চারিত্রিক দৈন্য এতই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, মার্জিতভাবে তা বলার জন্য নতুন শব্দ তালাশ করতে হয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতরা কেবল ইংরেজি ও ইউরোপীয় শিক্ষাই গ্রহণ করেনি, ইংরেজ ও ইউরোপের হেন কোনো অপকর্ম নেই, যা তারা গ্রহণ করেনি। সব প্রতিষ্ঠান ও সব ছাত্র-শিক্ষকের কথা বলা হচ্ছে না। ভালো-খারাপ মিলিয়েই দুনিয়া। সেখানেও অনেক চিন্তাশীল, নীতিবান, বিবেকবান মানুষ রয়েছেন। তাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

এবার মূল কথায় আসি, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের জন্য 'র‍্যাগ ডে' সুপরিচিত শব্দ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্তিতে পালিত আনন্দ-উৎসবের নাম 'র‍্যাগ ডে'। আসলেই কি আনন্দ-উৎসবের নাম 'র‍্যাগ ডে'? র‍্যাগ অর্থ জ্বালাতন করা, রসিকতার নামে কারো ওপর অত্যাচার করা, অত্যধিক হৈ-হুল্লোড়ের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা, ন্যাকড়া, ত্যানা বা টুকরা কাপড়, পুরনো ছেঁড়া কাপড়, অগোছালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ইত্যাদি।

কারো কারো মতে, র‍্যাগ অর্থ রসিকতার নামে কাউকে জ্বালাতন বা অত্যাচার করা। র‍্যাগ ডে মানে হলো জ্বালাতন বা অত্যাচারের দিন। যারা পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে বিরক্ত, আনন্দের নামে কাণ্ডজ্ঞানহীন বাড়াবাড়ি যাদের অপছন্দ, ঢোলবাদ্য বাজনা, ছেলেমেয়ে রং নিয়ে মাখামাখি, ছেলেমেয়ের একই পোশাকে নাচানাচি যাদের অস্বস্তির কারণ, তাদের জন্য দিনটি জ্বালাময়, অত্যাচারিত হওয়ার দিন। এই দিনে অনেক রক্ষণশীল ভাইবোনের লজ্জা, রুচিশীলতা, পর্দানশীলতা স্বকীয়তার পতন ও ভালোমানুষির পরাজয় হয়। তারা ভুলে যায়, একদিন কেন, এক মুহূর্তের জন্যও জেনেবুঝে সীমা লঙ্ঘন অমার্জনীয়। বাদ্য-বাজনা, হিন্দি-ইংলিশ গানের গগনবিদারী আওয়াজে ক্যাম্পাস রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয় এদিন। ছাত্রদের স্যারের লেকচারে মনোযোগ আসে না। পরীক্ষার হলে স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত। তাহলে এটা জ্বালাতন অথবা অত্যাচার দিবস নয়?

আমি নিজের চোখে ছবিতে দেখেছি, র‍্যাগ ডের নামে ছেলেমেয়েদের যে উদ্দাম মাখামাখি ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে হয়, এর তুলনা চলে নাইট ক্লাবের বাঁধভাঙ্গা নৃত্যের সঙ্গে।

'র‍্যাগ ডে'র পাশাপাশি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে 'র‍্যাগিং সংস্কৃতি'। 'র‍্যাগ ডে' ও 'র‍্যাগিং'–দুটোই পশ্চিমা দেশগুলো থেকে ফেরি করা সংস্কৃতি। ব্রিটিশদের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করব, মাগার ইংরেজদের কালচার গ্রহণ করব না, তা কি হয়? হ্যাঁ, সে জন্যই চালু হয়েছে 'র‍্যাগিং সংস্কৃতি'।

জনপ্রিয় অনলাইন পরিবর্তন ডটকমে এ বিষয়ে একটি আর্টিক্যাল ছাপা হয়েছে বছরখানেক আগে। লেখাটির শিরোনাম হলো–'র‍্যাগিং : বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধকার আচার'।

এই শিরোনামের অধীনে লেখক সাইদ রহমান লিখেছেন, "রঙ্গভরা বঙ্গদেশ! দেশটা যখন রঙ্গে ভরা, তখন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও রঙ্গ-তামাশা থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। এসব রঙ্গ-তামাশার ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতির(!) নামে বিভিন্ন নির্যাতন বলবৎ আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এর মধ্যে 'র‍্যাগিং' ও 'গেস্ট রুম' সংস্কৃতিই সবচেয়ে এগিয়ে। দুটোর বৈশিষ্ট্য প্রায় কাছাকাছি। পার্থক্য শুধু–যেসব ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংটা খুব একটা বাজার করতে পারেনি, সেই সব ক্যাম্পাসে গেস্ট রুম নামে আজব এক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। চিত্তবিনোদন মানে বিকৃত চিত্তবিনোদন, অন্যকে নির্যাতন করে যে মজা পাওয়া যায়। সব কালে, সব সমাজেই কিছু পারভার্ট থাকে, কিন্তু এমন সংঘবদ্ধ

পারভার্ট সম্ভবত আড়াই হাজার বছর আগের গ্রিক সমাজেই শুধু ছিল, যারা আয়েশ করে বসে মানুষের মৃত্যু উপভোগ করত।.....এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ছাত্রীর কলমে উঠে আসল র‍্যাগিংয়ের ভয়াবহতা। অবশ্য কিছুদিন আগে থেকেই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর হয়েছে। কিন্তু একি! এমন স্পষ্ট একটি নোংরামিকেও জায়েয করার জন্য উঠেপড়ে লাগল একটি গোষ্ঠী। মানুষ বিকৃতির কোন সীমায় পৌঁছালে কাউকে নির্যাতন করে আনন্দ পাওয়ার এই ব্যবস্থা জারি রাখতে চায়। বিকৃত রুচির মতো এদের ব্যাখ্যাও বিকৃত, শুরু হলো র‍্যাগিংয়ের সুশীল ব্যাখ্যা।" (পরিবর্তন ডটকম : নভেম্বর ০১, ২০১৬)

বাংলাদেশের সরকারি বা বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জীবনাচার কাছে থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু কারণে-অকারণে সেগুলোতে আসা-যাওয়া করা খুবই স্বাভাবিক।

এমনকি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুমহল ও পরিচিতদের মাধ্যমে সেখানকার কিছু চিত্র আমাদের নজরে আসা অস্বাভাবিক নয়। খুবই লজ্জিত, ব্যথিত ও বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর বর্ণনা আমি তুলে ধরতে চাই। ইতিহাসের দায়বদ্ধতা থেকেই আমাকে কথাগুলো লিখতে হচ্ছে। তবু আমি লজ্জিত।

দেশের নামকরা একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলগুলোতে থাকেন, এমন কয়েকজন বন্ধু এ গল্প শোনান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদগুলোতে পা রাখা যায় না–এত বিপুল পরিমাণ কনডম সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

বাংলাদেশের আরেকটি প্রাগ্রসর ও প্রথমসারির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমার বন্ধু স্থানীয় বড় ভাই সাজ্জাদ (ছদ্মনাম) কথাচ্ছলে একদিন আমাদের জানিয়েছেন, তাঁদের বিভাগে ইংরেজি-১০৫ বিষয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ চালিয়ে এর ফলাফল জমা করতে হয়। বিভিন্নজন বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু একটি মেয়ে উদ্ভট একটি বিষয়ে জরিপ চালাতে বলে। সে দাবি জানায়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগে কত শতাংশ 'গে' (সমকামী) আছে, তার একটি জরিপ করা হোক। পরিশেষে তার দাবি গৃহীত হয়। পরে জরিপে দেখা গেল, ৪২ শতাংশ ছেলে-মেয়ে সেখানে সমলিঙ্গের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে অভ্যস্ত। আশ্চর্য হলো, বিষয়টা খোলামেলা বলতেও তাদের কোনো আপত্তি নেই! (বিষয়টি এখানে লেখার সময় পুনরায় সাজ্জাদ ভাইয়ের অনুমতি ও তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করা হয়েছে)।

এটাই এখন বাস্তবতা। ব্রিটিশদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ আমাদের এত দূর নিয়ে গেছে।

আমার এক আত্মীয়ের দোকান আছে উত্তরায়। সে আমার বাল্যবন্ধুও বটে। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমি ওই দোকানে যেতাম। সেখানে দীর্ঘ যাতায়াতে যাদের সঙ্গে সখ্য হয়, তাদের একজন উৎপল (ছদ্মনাম)।

উত্তরা টাউন কলেজে তিনি পড়ালেখা করেন। একদিন কথার ফাঁকে তিনি গর্ব করেই বললেন, ক্ষুদ্র এ জীবনে তিনি ৪৩টি প্রেম করেছেন। প্রত্যেক মেয়ের সঙ্গেই নাকি তাঁর শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে।

পরে একদিন শুনলাম, তিনি নামাজ-রোজা ধরেছেন। কেননা তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ।

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ভাইয়ের নৈতিক অধঃপতন বিষয়ে সর্বপ্রথম আমাকে তথ্য দিয়েছে আমার বাল্যকালের সহপাঠী মাশহুর (ছদ্মনাম)। একসময় সে মাদ্রাসায় পড়ত। পরে সে স্কুলে চলে যায়। ঢাবির দেয়ালঘেঁষা উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ত সে। এখন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। এই উদয়নেই একবার ফুলহাতা জামা পরার 'অপরাধে' এক শিক্ষার্থীর জামার হাতা কেটে দেয় একজন শিক্ষিকা। বিষয়টা গণমাধ্যমেও এসেছে। যা-ই হোক, সে আমাকে বলেছে, আমাদের স্কুলের পরিবেশ এমন, যার যাকে ভালো লাগে, সম্পর্ক করছে, এতে অন্যদের মাথাব্যথা নেই। এমনকি ক্লাসের টুকরো সময়ে অনেকে আলোচনা করে এ বিষয়ে যে কে কার সঙ্গে কতবার 'ফিজিক্যাল রিলেশন' করেছে!

বড় অবাক হলাম! সে আমাকে বলেছে, একটা মেয়ে ইংরেজিতে দুর্বল ছিল। বড়লোকের মেয়ে। মেয়েটি একজনের কাছ থেকে ইংরেজি বুঝিয়ে নেয়। বিনিময়ে শারীরিক সম্পর্ক!

আরেকটি মেয়ে সম্পর্কে মাশহুর আমাকে বলেছে, এক 'নিষিদ্ধ' আবাসিক ফ্ল্যাটে এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কেন 'এ পথে' এলে? সে সেন্ট জোসেফ নামক ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পড়ত। অকপটে মেয়েটি উত্তর দেয়, '৫৫ হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল সেট আমার প্রয়োজন। তাই.....।'

ভাগ্যিস, বর্তমানে শিক্ষা-বাণিজ্যের যে অবস্থা, তাতে লেখাপড়ার অর্থ জোগাতে কাউকে কুমারিত্ব বিসর্জনের পথ বেছে নেওয়ার খবর অন্তত বাংলাদেশে বের হয়নি, যদিও ইউরোপে এরও নজির আছে! খবরেই বলা হয়েছে, 'উচ্চশিক্ষার জন্য নিজের কুমারিত্ব নিলামে তুললেন রাশিয়ান এক তরুণী!'(কালের কণ্ঠ অনলাইন : ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

কেবল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা? মোটেই নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় তো এখন সেই শৈশব থেকেই শিশুদের 'যৌন শিক্ষা' দেওয়া হয়। মেয়েদের

ঋতুস্রাব, দৈহিক ক্রমবৃদ্ধি ও কনডমের ব্যবহার বিষয়ে এখন আমাদের শিশুদের শৈশব, কৈশোর থেকেই 'সচেতন' করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহজলব্ধ প্রযুক্তি।

কেবল শিক্ষাব্যবস্থাকে দোষ দিয়ে লাভ কী। পারিবারিক অনুশাসনের অভাব, অসৎ সঙ্গী গ্রহণ, গণমাধ্যমের কথিত বিনোদন সম্প্রচার ও আধুনিক প্রযুক্তিও আমাদের এ অধঃপতনের জন্য কম দায়ী নয়। বেসরকারি সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলছে, 'ঢাকায় স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ ভাগ পর্নোগ্রাফি দেখে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেশে তৈরি এই পর্নোগ্রাফিগুলোতে যাদের ভিডিও দেখানো হচ্ছে, তাদের বয়স ১৮-এর কম।' (দৈনিক প্রথম আলো : ০১ অক্টোবর ২০১৬)

এর ফল যা হওয়ার, তা-ই হচ্ছে। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের পারিবারিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে। বিয়ের আগের অবাধ যৌনতা বিবাহিত জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। বিশ্বজুড়ে অস্বাভাবিক হারে বিয়ে বিচ্ছেদ বেড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা বলছেন, বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য অনেকগুলো কারণ থাকলেও বিয়ের আগে স্বামী বা স্ত্রীর ঠিক কতগুলো যৌন সম্পর্ক ছিল তার ওপরই বিচ্ছেদের আশংকা নির্ভর করছে। যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ ইউনিভার্সিটির ফ্যামিলি অ্যান্ড কনজ্যুমার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক নিকোলাসা এইচ ওয়ালফিঙ্গার এই গবেষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিয়ে বিচ্ছেদ নিয়ে ২০০০ সাল থেকে গবেষণা করছেন তিনি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে বিয়ের আগে কোনো ব্যক্তির যদি ১০ বা তার অধিক যৌন সম্পর্ক থাকে, তার বিয়ে বিচ্ছেদের ঝুঁকি অনেক বেশি। এই অধ্যাপকের মতে, বিয়ের পর নারী-পুরুষ যদি ধর্ম পালন করে তাহলে তাদের বিচ্ছেদের আশংকা কম থাকে। তিনি বলেন, যে দম্পতিরা বেশিবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যান, তাঁদের সম্পর্ক টেকার সম্ভাবনা বেশি। আর যাঁরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এড়িয়ে চলেন, তাঁদের বিচ্ছেদের আশংকা বেশি। (দৈনিক যুগান্তর অনলাইন : ১১ জানুয়ারি, ২০১৭)

অনৈতিকতা চর্চার আরেক উপাদান হলো মাদকাসক্তি। নানা কারণে আমাদের দেশে মাদকের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদেরই কিছু ভাই এর করালগ্রাস থেকে রেহাই পায়নি।

গণমাধ্যমে কখনোই কোনো বিষয়ে সব তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সেখান থেকে ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একটি পত্রিকার শিরোনাম দেখুন : 'ক্যাম্পাসে মাদকের ভয়াল থাবা'। সেখানে খবরের ভেতরের অংশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে মাদকের থাবা দিন দিন বেড়েই চলছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকসেবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের বেশি স্মার্ট বানাতে তারা গ্রহণ করছে মাদকদ্রব্য। পিছিয়ে নেই মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরাও। এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট মেডিক্যালের শিক্ষার্থীরা একটু বেশি এগিয়ে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও সেবনে ছাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়েই চলছে। বেশির ভাগ মাদক গ্রহণকারী শিক্ষার্থী কৌতূহলের বশে বা বন্ধুদের তাড়নায়, সাময়িক কোনো হতাশার কারণে, নিছক শখ ও ফ্যাশন হিসেবে প্রাথমিকভাবে মাদক গ্রহণ করে। এরপর ধীরে ধীরে তার শরীর ও মন মাদকনির্ভর হয়ে পড়ে। আর ক্যাম্পাসে মাদকদ্রব্য গ্রহণে প্রধান ভূমিকা পালন করে মানসিক হতাশা আর প্রেমে ব্যর্থতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ মাদক গ্রহণকারী ছাত্রীরা প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই মাদক গ্রহণ করে থাকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হেরোইন, ইয়াবার পাশাপাশি ফেনসিডিল, মরফিন, পেথিডিন, বিয়ার, চেতনানাশক ঘুমের ওষুধ, কাশির সিরাপ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক গ্রহণ বেড়েই চলছে। সেবনকারীদের কয়েকজন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের ওষুধের দোকান থেকে কাশির সিরাপ চাইলেই নেশা উদ্রেককারী সিরাপ দেওয়া হয়। আর ঘুমের ওষুধের জন্য যেকোনো পরিমাণ সিডিল, নকট্রিন নামক চেতনানাশক ঘুমের ওষুধ কোনো প্রকার ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই সেখানে পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই সহজে ঘুমের ওষুধ, সিরাপ, জুস মিশিয়ে নতুন এক ধরনের মাদক নিজেরাই তৈরি করেন। প্রকাশ্য বিয়ার বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অভিযোগ আছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন এলাকা ও বেশ কিছু দোকানে বিয়ার বিক্রয় করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদক সেবনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা একটু বেশি। আর এর প্রধান কারণ হাতের নাগালেই পাওয়া যায় এসব মাদকদ্রব্য। উদ্বেগজনক বিষয় হলো সহজলভ্য হওয়ায় ঢাবির অনেক মেধাবী ছাত্র পা বাড়িয়েছে নেশার জগতে। সন্ধ্যার পর এরা মাদক সেবন করে বুঁদ হয়ে আড্ডা জমায়। (দৈনিক যায়যায়দিন : ২২ অক্টোবর, ২০১২)

নারী শিক্ষার্থীদের কী অবস্থা? একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট দেখুন :

দেশে মদে আসক্ত নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক

পরিসংখ্যান, ৬ লাখ নারী নিয়মিত মদ পান করেন। দেশে মদ পানকারীর সংখ্যা ৬০ লাখ। এর মধ্যে ১০ শতাংশই হচ্ছেন নারী। আর এর বেশির ভাগ হচ্ছে তরুণী। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, যেসব নারীর মদে আসক্তি রয়েছে এর বেশির ভাগ উচ্চবিত্ত পরিবারের। ৬ লাখ নারী মদ পানকারীর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ হচ্ছে বিভিন্ন বয়সী। আর এর মধ্যে ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, বাকি ৪০ শতাংশ হচ্ছে নারী শিক্ষার্থী। যারা দেশের বিভিন্ন কলেজ ও সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। (দৈনিক মানবজমিন : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭)

আচ্ছা, এমন মাদকাসক্তিতে কেবল বখাটে ছেলে-মেয়েরা জড়াচ্ছে? এর জবাব রয়েছে অন্য প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, 'মেধাবী শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি মাদকাসক্ত হয়।' (দৈনিক কালের কণ্ঠ অনলাইন : ২৬ ফেব্রুয়ারি : ২০১৭)

এসব ঘটমান, ইতিহাস ও পরিসংখ্যান এ জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে, কওমী মাদ্রাসায় পড়ুয়া কেউ এ ধরনের এভাবে জীবন, পরিবার ও সমাজের ক্ষতি করছে না–এটা নিন্দুকেরাও মেনে নিতে বাধ্য।

অনৈতিকতা চর্চার আরেকটি দিক হলো সনদ বাণিজ্য ও গবেষণা চুরি। এ বিষয়েও একটু-আধটু খবর বেরিয়েছে গণমাধ্যমে। একটি পত্রিকার নির্মম শিরোনাম দেখুন : 'গবেষণায় চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা।' ওই খবরে আরো বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অন্যের গবেষণাপত্র থেকে হুবহু নকল করা ও একই গবেষণা নিবন্ধ দুই জার্নালে ছাপানোর অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তদন্তে গবেষণায় চুরির প্রমাণ মেলায় এ শিক্ষককে সহযোগী অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে অবনমন করা হয়।

এর আগে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক আরেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠে গবেষণায় (থিসিস) ভুল তথ্য সংযোজনের অভিযোগ। গবেষণা নিবন্ধে সাড়ে ১২ লাখ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বলে আজগুবি তথ্য উপস্থাপন করেন তিনি।

কুতুবুল ইসলাম নোমানি কিংবা নূর উদ্দিনের মতোই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় পাঠদানরত বিভিন্ন শিক্ষকের বিরুদ্ধে গবেষণা চুরির অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের মতো পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধেই এ ধরনের অভিযোগ বেশি। এর বাইরে দেশের স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশ কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধেও গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনের অভিযোগ রয়েছে। (দৈনিক বণিকবার্তা : এপ্রিল ০৪, ২০১৭)

এ বিষয়ে দৈনিক মানবজমিনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, টাকায় মিলছে থিসিস। নবীন গবেষকরা রাজধানীর নীলক্ষেতকে ইদানীং থিসিসের আঁতুরঘর হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি সব ধরনের থিসিস এখানে পাওয়া যায়। এ ছাড়া একজনের থিসিস অন্যজন হুবহু নকল করে জমা দেওয়ার রেকর্ড আছে। গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের থিসিস হুবল নকল করে একজন শিক্ষক তাঁর গবেষণাকাজে ব্যবহার করেন। পরে এটি ধরা খেলে ওই শিক্ষকের ডিগ্রি সাময়িক বাতিল করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ বিভাগের শিক্ষক ড. ফজলে খোদা সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, আমার পিএইচডি করতে ৫ বছর সময় লেগেছে। গবেষণা সময় দিতে গিয়ে আমি আমার পরিবারকে সময় দিতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি দুই দফা বাড়িয়েছি। কয়েক দফা থিসিস বাতিল হয়েছে। পুনরায় করতে হয়েছে। আর বাংলাদেশে নাকি অনলাইনে পিএইচডি পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, পূর্ণকালীন চাকরিজীবীরা ছুটি না নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। তাঁর মতে, পিএইচডি পর্যায়ে খণ্ডকালীন গবেষণা করা মুশকিল। এটা সম্ভব নয়। তার পরও বাংলাদেশে এগুলো হচ্ছে। বাংলাদেশে পিএইচডির মান তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে বলে মত তাঁর। (দৈনিক মানবজমিন : ২৩ এপ্রিল ২০১৬)

বোঝা গেল, আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে যতই শিক্ষিত হই না কেন, নৈতিক শিক্ষা না থাকলে এই শিক্ষা বিপ্লব দেশ ও সমাজের কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। আর এটা অস্বীকারের সুযোগ কোথায় যে নৈতিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো ধর্মীয় শিক্ষা। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলো, ব্রিটিশদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা ক্রমেই যেন ধর্মীয় শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। এর বিপরীতে কওমী মাদ্রাসার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো এই মাদ্রাসাগুলো ছাত্রদের মন ও মননে নৈতিকতার ইমারত নির্মাণ করে। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশে যত শ্রেণী-পেশার মানুষ আছে, সার্বিক দিক থেকে সবচেয়ে কম অপরাধ করে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা। বিশ্বাস না হলে পর্যবেক্ষণ করুন। (অসমাপ্ত)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : মুহরিম

মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ
কাচনা, রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

একজন বালেগ পুরুষ কোন কোন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে? বিশেষ করে খালা শাশুড়ির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে কি?

সমাধান :

একজন বালেগ পুরুষ নিম্নে বর্ণিত মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। (১) আপন মা, (২) সৎমা, (৩) দাদি, (৪) নানি, (৫) সহোদরা বোন, (৬) বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রিয়া বোন, (৭) পিতার সহোদরা বোন তেমনি বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রিয়া বোন, (৮) আপন জননীর সহোদরা ও বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রিয়া বোন, (৯) নিজের মেয়ে এবং নিম্নে যত যাবে, (১০) বোনের কন্যা যত নিচের দিকের হোক, চাই সহোদরা বোনের কন্যা হোক বা বৈমাত্রেয়া বা বৈপিত্রিয়া বোনের কন্যা হোক, (১১) ভাতিজি চাই আপন হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের হোক, (১২) শাশুড়ি, (১৩) দুধ মা, (১৪) দুধ বোন, (১৫) এবং সহবাসকৃত স্ত্রীর অন্য ঘরের কন্যা। খালা শাশুড়ির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। কারণ সে তার মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। (সূরা নিসা-৪/৮২, হিদায়া-৩-৪/৩০৭)

প্রসঙ্গ : কোরবানীর গোশত বণ্টন

মুহাম্মদ রেজওয়ানুল হক
আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকার একটা নিয়ম চালু আছে তা হলো, আমরা যে কোরবানী দিই তার তিন ভাগের এক ভাগ মালতে তথা গোষ্ঠীর মাতব্বরের বাড়িতে প্রেরণ করি। গোষ্ঠীর যত পরিবার আছে ততগুলো ভাগ করা হয়। যারা কোরবানী দিয়েছে, তারাও নেয় এবং যারা দেয়নি তারাও নেয়। গরুর গোশত দিয়ে খাসির গোশত এবং খাসির গোশত দিয়ে গরুর গোশত নেওয়া হয়। আমার জানার বিষয় হলো, এসব বিষয় জায়েয আছে কি? যদি জায়েয না থাকে দলিল সহকারে উল্লেখ করলে উপকৃত হব।

সমাধান :

কোরবানীর গোশতের ব্যাপারে কোরবানীদাতার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে, সে চাইলে পুরোটা নিজের জন্য রেখে দিতে পারে বা যাকে যতটুকু ইচ্ছে দিতে পারে। তিন ভাগের বিষয়টি ঐচ্ছিক এবং মুস্তাহাব মাত্র। সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে গোশত জমা করা বা লজ্জায় পরে গোশত দেওয়ার মতো প্রথা শরীয়ত সমর্থিত নয়। উপরন্তু অনেকের মান্নতের কোরবানী হয়ে থাকে, যার গোশত নিজে বা ধনী ব্যক্তি খেতে পারে না। এমতাবস্থায় সামাজিক ওই প্রথাটি অবশ্যই বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। (মুসনাদে আহমদ-১৫/২৯৩, রদ্দুল মুহতার-৬/৩২৭, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী-৫/৩০০)

প্রসঙ্গ : কবর যিয়ারত

মাও. রুহুল আমীন
কদমশ্রী, মদন, নেত্রকোনা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় শবে বরাতে, শবে কদরে, শবে মেরাজে, রমাযানের রাত্রিতে, ঈদের রাত্রে ও দিনে, জুমু'আর রাত্রে ও দিনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সময় নির্ধারণ করে ইমাম-মুয়াজ্জিন অথবা অন্য যেকোনো হুজুরের নেতৃত্বে সমস্বরে সূরা ইয়াছিন ও অন্য সূরাগুলো তেলাওয়াত করে ইজতেমায়ী অর্থাৎ যৌথভাবে যিয়ারত ও দু'আ করা হয়। এটা কি কবর যিয়ারত করার সুন্নাত ত্বরিকা? নাকি নাজায়েয, উল্লেখিত নিয়ম যদি সুন্নাত না হয় তাহলে কবর যিয়ারত করার সুন্নাত ত্বরিকা কী বিস্তারিত রেফারেন্স সহকারে লিখে বাধিত করবেন।

সমাধান :

শবে বরাতে, শবে কদরে ও অন্যান্য বিশেষ দিনগুলোতে যৌথভাবে যিয়ারত ও দু'আর যে প্রথা চালু আছে এটা কবর যিয়ারত করার সুন্নাত ত্বরিকা নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) একাকী কবর যিয়ারত করেছেন, সম্মিলিতভাবে নয় এবং কোনো হাদীসেও সম্মিলিততভাবে যিয়ারতের কথা বলেনি। সুতরাং সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত ও দু'আর যে প্রথা চালু আছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরিহারযোগ্য। কবর যিয়ারত করার সুন্নাত ত্বরিকা হলো এই, যখন কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে কবরের নিকট পৌঁছবে তখন মৃত ব্যক্তির পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে গিয়ে চেহারার সম্মুখে দাঁড়াবে। অতঃপর এভাবে সালাম দেবে–

السلام عليكم اهل الديار من المؤ منين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم

لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية

তারপর সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারার শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, আমানার রাসূল থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা ইয়াছিন, সূরা মুলুক, সূরা তাকাছুর, সূরা ইখলাস ইত্যাদি পড়ে দু'আ করবে। বিশেষত দু'আ করার জন্য হাত তোলার প্রয়োজন নেই। যদি হাত উঠিয়ে দু'আ করতে চায়, তাহলে কবরের দিকে মুখ করে হাত উঠাবে না। বরং কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করবে। (রদ্দুল মুহতার-২/২৪২, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৬২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৭৭৪)

প্রসঙ্গ : নামায ও হজের বিধান

মুহাম্মদ জামিল হোসেন
বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

১। মিনা, মুযদালিফা, আরাফাসমূহের ময়দানে উপস্থিত হয়ে কিভাবে নামায আদায় করব?

২। মুকীম অবস্থায় কিভাবে এবং মুসাফির অবস্থায় কিভাবে নামায আদায় করব?

৩। মেয়েদের জন্য কংকর মারা জরুরি কি না? এবং কয় দিন মারতে হবে?

সমাধান : ১-২

নামায কসর করা ও পূর্ণ করার বিধান মুসাফির হওয়া, না হওয়ার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং মিনা, মুযদালিফা, আরাফার ময়দানে মুসাফির হাজী কসর করবে মুকীম নামায পূর্ণ করবে। তবে ইমাম যদি মুকীম হয় তাহলে মুসাফিরও নামায পূর্ণ করবে। ৯ তারিখে আরাফায় মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলে যোহর ও আসর একত্রে ইমামের পেছনে আদায় করে নেবে আর তা সম্ভব না হলে যোহরের সময় যোহর এবং আসরের সময় আসর পড়তে হবে। আরাফা থেকে সূর্যাস্তের পর মুযদালিফায় গিয়ে এশার সময় মাগরিব ও এশা একত্রে এক আযান ও এক ইকামতে আদায় করে নেবে। (আদ্দুররুল মুখতার-১/১৬৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৩/১৭০)

সমাধান-৩ :

মেয়েদের জন্যও ১০ তারিখে জামরায়ে আকাবা ও ১১, ১২, ১৩ তারিখে তিন জমরাতেই কংকর মারা জরুরি। তবে কেউ যদি ১২ জিলহজ সন্ধ্যার পূর্বে বা সন্ধ্যার পর ভোর হওয়ার আগে মিনা ত্যাগ করে তার জন্য ১৩ তারিখে কংকর মারা জরুরি নয়। (বাদায়েউস সনায়ে-৩/৯১, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/৫৭৭)

প্রসঙ্গ : ভরণপোষণ

মাও. আব্দুল জাব্বার
নারায়ণগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

এক লোকের তিন ছেলে আছে। তারা সকলেই বিবাহিত। তাদের একজন পাগল হয়ে গেছে, আর তার দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান স্কুলে পড়ালেখা করে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, পাগল ব্যক্তির ও তার দুই ছেলের লেখাপড়ার খরচ কে বহন করবে? পাগলের বাবা না দুই ভাই? না দুই সন্তান? উল্লেখ্য, পাগলের কোনো সম্পদ নেই তবে তার বাবার অনেক সম্পদ আছে, যা বণ্টন করে দেয়নি। এমতাবস্থায় পাগলের দুই ভাইয়ের যদি তাদের বাবার কাছে বলে যে আমাদেরকে তোমার সম্পত্তি ভাগ করে দাও, আর আমাদের দুই ভাইকে এত এত বেশি দাও, তাহলে আমরা তোমার পাগল ছেলের ও তার দুই সন্তানের খরচ বহন করব। এখন যদি তাদের বাবা তাই করে, তাহলে কি তা শরীয়তের খেলাফ হবে?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেসন্তান সুস্থ-সবল হলে তাদের ভরণপোষণ বা লেখাপড়ার খরচ বহনের দায়িত্ব পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের ওপর বর্তায় না, বরং তারা নিজেরা আয়-রোজগার করে খরচ চালাতে হবে। তবে কেহ স্বেচ্ছায় তাদের খরচ বহন করলে তা ভিন্ন কথা। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বয়স্ক ছেলেসন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহনে বাপ-চাচা কেহই বাধ্য নয়। আর অসুস্থ/পাগল ব্যক্তির ভরণপোষণের ব্যবস্থা তার বয়স্ক সন্তানদের পক্ষে করা সম্ভব হলে তারাই করবে, অন্যথায় তার বাবার ওপর এ দায়িত্ব বর্তাবে। এমতাবস্থায় পাগলের বাবা যদি নিজ জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিতে চায়, তবে সকল সন্তানকে সমানভাবে দেওয়া উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (রদ্দুল মুহতার-৩/৬২৪-২৫, মজমাউল আনহার-২/১৯৪, শরহে ফতহুল কদির-৪/৪২০)

প্রসঙ্গ : ইমামত

মুহাম্মদ জামান
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিনের ইকামত দেওয়ার পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বলেন–কাতার সোজা করি, সামনের কাতার পুরা করি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াই, ফাঁকা জায়গা বন্ধ করি–তারপর কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করেন। ইহা হানাফী মাযহাবে সহীহ কি না? সহীহ না হলে সহীহটি কী?

সমাধান :

মুয়াজ্জিনের ইকামতের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে ইমাম সাহেবের এ কথা বলা যে–কাতার সোজা করি, সামনের

কাতার পুরা করি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াই, ফাঁকা জায়গা বন্ধ করি–এটা সহীহ হাদীস ও ফিকহে হানাফী দ্বারা প্রমাণিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইকামত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝখানে বেশি বিরতি না হয়। (বুখারী শরীফ-১/১০০, মুসলিম শরীফ-১/১৮২, আবু দাউদ শরীফ-১/৯৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদে খতম

মাও. কামরুল ইসলাম
বাহুবল, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশের অনেক মাদরাসাতে নামাযের পর মসজিদে বসে ছাত্র-শিক্ষকগণ খতমে ইউনূছ ইত্যাদি পড়েন, অথচ আমরা কিতাবে পেয়ে থাকি যে মসজিদে বিনিময় নিয়ে কোনো কাজ করা যায় না। তবে অনেক আলেমগণ বলেন, প্রয়োজনের কারণে তা জায়েয হবে। তাই হযরতের কাছে জানার বিষয় হলো, ব্যাপকভাবে এই আমল চলার কারণে প্রয়োজনে তা জায়েয হবে কি না? অথবা জায়েযের পদ্ধতি কী হতে পারে?

সমাধান :

মাদরাসার মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকগণ নামাযের পর বসে যে সকল খতম পড়ে থাকেন যেমন খতমে ইউনূছ, খতমে তাহলীল ও বুখারী শরীফ ইত্যাদি। এগুলো যদি বিনিময় নিয়ে পড়া হয় তাহলে মসজিদে পড়া মাকরূহ হবে। আর যদি اجرت ছাড়া পড়া হয় তাহলে বৈধ হবে। (হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদিন-৯/৭০৭, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-১৪/২০৯)

প্রসঙ্গ : মিম্বর

মাও. সাইফুল ইসলাম
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় মসজিদে মেহরাবের মধ্যে ইমাম সাহেবের নামাযে দাঁড়ানোর স্থান থেকে ডান দিকে দেড় হাত ওপরে খুতবা দেওয়ার মিম্বার অবস্থিত। উক্ত মিম্বরে উঠতে হলে মেহরাবের বাম দিক হয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ডান পাশে আসতে হয়। উল্লেখ্য যে পেছনের সিঁড়িটা মেহরাবের পেছনে মসজিদের ভেতরে অবস্থিত। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মসজিদের মধ্যে এভাবে মিম্বর করা শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

যেকোনো উঁচু স্থানে খুতবা দিলে মিম্বরের সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের মিম্বর বানাতে শরয়ী কোনো সমস্যা নেই। তবে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর মিম্বরের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার জন্য এ ধরনের মিম্বরের পরিবর্তে সাদাসিধা তিন ধাপের মিম্বর বানানো উত্তম। (বযলুল মাজহুদ-৫/১০০, হাশিয়ায়ে তাহাবী-৫১০, ফাতাওয়ায়ে শামী-৩/৩৯)

প্রসঙ্গ : হেবা

হাজী আবু ছিদ্দিক মোল্লা
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার চার ছেলে। মেজ ছেলে মৃত এবং এক মেয়ে এবং আমার মেজ ছেলের ঘরের একটি নাতি আছে। আমি আমার জীবিত ছেলেদের মধ্য বাড্ডায় এক-দেড় কাঠা করে জমি দিই এবং মেয়েকে তিন কাঠা গাজীপুরে জমি দিই এবং মৃত ছেলের ঘরের নাতিকে আধা কাঠা জমি দিই। তবে মেয়ের তিন কাঠা আর ছেলের এক-দেড় কাঠার মূল্য প্রায় সমপরিমাণের। আমি তাদের মাঝে সম্পদ কমবেশ করে দেওয়ার কারণে কোনো গোনাহের ভাগি হব কি না? আর আমার মৃত ছেলের ঘরের নাতি ইসলামী দৃষ্টিকোণে আমার থেকে কোনো সম্পদ পাওয়ার হক রাখে কি না? এবং পিতা ছেলেদের বঞ্চিত করতে পারবে কি না?

সমাধান :

আপনার মেয়ে এবং ছেলেদের নামে হেবাকৃত জমির মূল্য যদি বাস্তবেই সমপরিমাণ হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বিহিত কারণে কমবেশি হলেও যদি কারো ক্ষতিসাধন বা ঠকানো উদ্দেশ্য না হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। যদি বিহিত কারণ ছাড়া ঠকানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে গোনাহগার হবেন। আর আপনার মৃত ছেলের ঘরের নাতি আপনার মৃত্যুর পর শরীয়তের দৃষ্টিতে যেহেতু ওয়ারিশ হিসেবে আপনার কোনো সম্পদ পাবে না, তাই জীবদ্দশায় তাদের কিছু হেবা করে যাওয়া তাদের প্রতি সহানুভূতি ও মানবতার বহিঃপ্রকাশ, যার প্রতি শরীয়তেও উৎসাহিত করা হয়েছে। যে আধা কাঠা তাকে দিয়েছেন যদি তার ভোগদখলে দিয়ে থাকেন বা সে অপ্রাপ্ত বয়সী হয় তাহলে সে হেবা সূত্রে ওই জমির মালিক হয়ে যাবে। পিতা জীবদ্দশায় কোনো সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। যদি সন্তান বাপের পুরোপুরি অবাধ্য হয়। তবে পিতা জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টন না করে থাকলে ছেলেদের বঞ্চিত ঘোষণা করলেও মৃত্যুর পর ছেলেরা মীরাস পাবে। (আদদুররুল মুখতার-৩/৩৯৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-৪/৪০০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৬/২৩৭)

প্রসঙ্গ : পাক-নাপাক

মুফতী আরিফ বিল্লাহ

জিজ্ঞাসা :

যদি মুরগির ভেতরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা ব্যতীত গরম পানিতে ড্রেসিং করা হয় তাহলে উক্ত মুরগি

খাওয়া বৈধ হবে কি?

সমাধান :

মুরগি জবেহ করে ভেতরের নাপাকি পরিষ্কার করা ব্যতীত যদি ফুটন্ত পানিতে এত বেশি সময় ধরে রাখা হয়, যার কারণে ভেতরের নাপাকির প্রতিক্রিয়া গোশতের মধ্যে প্রবেশ করার প্রবল ধারণা জন্মায় তাহলে মুরগিটি নাপাক হয়ে যাওয়ার কারণে খাওয়া বৈধ হবে না। সেটিকে পবিত্র করার কোনো অবকাশ নেই। আর যদি অল্প গরম পানিতে দেওয়া হয়, অথবা ফুটন্ত গরম পানিতে খুব অল্প সময়ের জন্য রাখা হয় যাতে ভেতরের নাপাকির প্রতিক্রিয়া গোশতের মধ্যে প্রবেশ করে না। তাহলে মুরগি নাপাক হবে না এবং তা খাওয়া বৈধ বলে বিবেচিত হবে তবে সতর্কতামূলক হাতে চামড়া ছাড়ানো উত্তম। (রদ্দুল মুহতার-১/৩৩৪, ফতহুল কদির-১/২১০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম-১৫/৪০১)

প্রসঙ্গ : ইমামতি

মুহাম্মদ জামান
উত্তরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের স্ত্রী বোরকা পরিধান করে, মুখ খোলা রেখে সরকারি চাকরি করেন। দ্বীনদার মুসল্লিদের তাঁর পেছনে নামায হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব যদি তার স্ত্রীকে বেপর্দায় চাকরি করা থেকে যথাসাধ্য বারণ করার চেষ্টা করে এবং সে তার স্ত্রীর বেপর্দার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার পেছনে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। অন্যথায় এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায পড়ার চেয়ে একজন যোগ্য দ্বীনদার ইমামের পেছনে নামায পড়ার চেষ্টা করবে। তবে তার পেছনে আদায়কৃত নামায সহীহ বলে বিবেচিত হবে। (মজমাউল আনহার-১/১৬৩, দুররুল মুখতার-১/৫৫৯)

প্রসঙ্গ : মহরে ফাতেমীর পরিমাণ

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান হিসাব অনুযায়ী মহরে ফাতেমীর পরিমাণ কত? এবং অধিকন্তু দেখা যায়, দ্বীনদার ব্যক্তিদের বিবাহে আগ্রহভরে তা ধার্য করা হয়, এর মাহাত্ম্য কী? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

বর্তমান হিসাব অনুযায়ী মহরে ফাতেমীর পরিমাণ হলো ১৩১.২৫ তোলা বা ১.৫৩০.৯ কিলোগ্রাম খাঁটি রুপা। তবে সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা বলা হয়ে থাকে। রুপার পরিবর্তে এর মূল্য দিতে চাইলে মহর আদায়কালে নিজ দেশে এর মূল্য (বা সতর্কতামূলক ১৫০ তোলা রুপার মূল্য) যা হবে তা মহরে ফাতেমী হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু হুজুর (সা.) আল্লাহ পাকের নির্দেশে নিজ কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে দিয়েছিলেন এবং হুজুর (সা.) স্বয়ং এই মহর ধার্য করেছিলেন, তা ছাড়া হুজুর (সা.)-এর অন্যান্য মেয়ে ও অধিকাংশ স্ত্রীর মহর এ পরিমাণই ছিল তাই দ্বীনদার মুসলমানগণ হুজুর (সা.)-এর অনুকরণের নিয়্যাতে বরকতের জন্য আগ্রহভরে তা ধার্য করে থাকেন। কিন্তু শুধু এটাকেই সুন্নাত বা জরুরি মনে করা বা সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও তা ধার্য করা ঠিক নয়। আর সামর্থ্যবান হলে মহরে ফাতেমীর চেয়েও বেশি ধার্য করতে পারে। (মুসলিম শরীফ-৫৯৯, ফাতহুল মুলহিম-৩/৪৮৪, মিরকাতুল মাফাতিহ-৬/৩২৯)

প্রসঙ্গ : টেস্টটিউব বেবি

মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন মোল্লা
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের বিয়ের বয়স ৯ বছর চলছে। বিবির জরায়ুতে শুক্রাণু প্রবেশ করার টিউবে ব্লক আছে একটি, আগে দুটি টিউবে ব্লক ছিল। চিকিৎসা (ল্যাপারাস্কপি) করার পর বর্তমানে একটি টিউব খোলা এবং আরেকটি টিউব বন্ধ। তাই ডাক্তারের পরামর্শ হলো, যেন আমরা টেস্টটিউব পদ্ধতিতে বেবি গ্রহণের চেষ্টা করি। কারণ আলহামদুলিল্লাহ স্বামীর বীর্য ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী ভালো আছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই বয়স, অর্থাৎ ৪০ বছর। তাই সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে সকল চিকিৎসা করার পর ডাক্তার টেস্টটিউব বেবির চেষ্টা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা হিসেবে টেস্টটিউব পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয বা বৈধ হবে কি না। বিঃদ্রঃ. টেস্টটিউব বেবি পদ্ধতি গ্রহণে স্বামী-স্ত্রী উভয়জনের বীর্যই যথেষ্ট হবে বলে ডাক্তারের অভিমত।

সমাধান :

টেস্টটিউব পদ্ধতিতে গর্ভসঞ্চারণ প্রক্রিয়া ডাক্তার তথা তৃতীয় পক্ষের পর্যবেক্ষণ ও হস্তক্ষেপে সম্পন্ন হলে এতে সীমাহীন নির্লজ্জতা ও অনেক শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড পাওয়া যায় বিধায় তা নাজায়েয। দু'আ ও বৈধ চিকিৎসার পরও সমাধান না এলে তাকদীরের ওপর

সন্তুষ্ট থাকা কিংবা বর্তমান স্ত্রীকে বুঝিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার আশা পূরণ করা যেতে পারে, তৃতীয় পক্ষের সহায়তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রী নিজেরাই টেস্টটিউব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলে তা জায়েয হলেও অনুত্তম। (রদ্দুল মুহতার-৯/৬১২, বাহরুর রায়েক-৪/২৬৩, কিতাবুন নাওয়াযেল-৮/৫৬০)

প্রসঙ্গ : লাশ বহন

মুহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে মাইয়্যেতকে খাটে উঠানোর পর একজন লোকের নেতৃত্বে মাইয়্যেতের খাট নিয়ে ৪০ কদম হাঁটা। কিছু কিছু আলেম বলেন, ইহার কোনো ভিত্তি নেই। আমার জানার বিষয় হলো, ইহা কোনো সহীহ হাদীস বা আমলযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

সমাধান :

মাইয়্যেতকে খাটে উঠানোর পর মাইয়্যেতের খাট নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার ইঙ্গিত হাদীসে রয়েছে। উপরন্তু ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি যেমন মাবসুতে সারখসী, বাদায়েউস সানায়ে, শামী, আলমগীরিতে ৪০ কদম হাঁটাকে মুস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (ইবনে মাজাহ শরীফ-১/২০৯, কিতাবুল মাবসুত-১/৫৭, রদ্দুল মুহতার-২/২৩১)

প্রসঙ্গ : কবরের সাওয়াল-জওয়াব

মুফতী আরিফ বিল্লাহ
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জিজ্ঞাসা :

কোনো মৃত ব্যক্তিকে যদি ১০ বা ১৫ দিন পর দাফন করা হয় তাহলে তার সাওয়াল-জওয়াব কোন সময় হবে?

সামাধান :

কবরের সাওয়াল-জওয়াবের বিষয়টি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম একটি আকীদা। অদৃশ্য জগতের এমন বিষয় মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথার ওপর নির্ভর করে মেনে নেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরেই এই সাওয়াল-জওয়াব হবে বলে বোঝা যায়। দেরিতে দাফন হলে এর ব্যতিক্রম হবে কি না এর কোনো উল্লেখ হাদীসে নেই। তাই এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো নিস্প্রয়োজন। (বুখারী শরীফ-১/১৭৮, আবু দাউদ শরীফ-২/৪৫৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/২২৬)

প্রসঙ্গ : কৃষি ব্যাংক থেকে লোন

মুহাম্মদ আব্দুল হক
বদরগঞ্জ, রংপুর।

জিজ্ঞাসা :

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ও খামার পরিকল্পনার জন্য নগদ অর্থ দেওয়া হচ্ছে। সে প্রদত্ত অর্থের ওপর সরকার কর্তৃক কোনো সুদ ধার্য করা হচ্ছে না। তবে ঋণগ্রহীতা সেই অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে বাধ্য। নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে না পারলে কৃষিজমি অথবা খামারের পণ্য জব্দ করা হবে কিংবা নতুন করে সুদ ধার্য করা হবে। আমার জানার বিষয় হলো, আমি কৃষি ও খামার পরিকল্পনার জন্য ৬ লাখ টাকা নিতে চাই। আর আমি পূর্ণ আশাবাদী ইনশাআল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে তথা তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে পারব, যদিও বা তা কৃষিজমি বিক্রি করে হয়। টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

সমাধান :

প্রশ্নোল্লিখিত পন্থায় ব্যাংক থেকে সুদ ছাড়া ঋণ নেওয়া একান্ত অপারগতার সময় অনুমতি আছে তবে তিন বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ আরোপ করার শর্তটি শরীয়তসম্মত নয়। তাই আপনি তিন বছরের মধ্যে অর্থ আদায়ের সামর্থ্যবান হওয়ার ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী হলে উক্ত ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। (আল-বাহরুর রায়েক-৬/১২৬, কেফায়াতুল মুফতী-১১/১৪৫)

প্রসঙ্গ : শেয়ারবাজার

লোটাস
বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের দেশে বিভিন্ন ব্রোকার হাউসে যে সমস্ত কোম্পানির শেয়ার বেচাকেনা হয় সেটা কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয?

সমাধান :

বর্তমানে প্রচলিত শেয়ারবাজারের কার্যকলাপ শরীয়াহ মোতাবেক না হওয়ায় তা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। হালাল-হারাম বেছে চলতে আগ্রহী সচেতন মুসলমানদের জন্য শেয়ারবাজারের লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (সূরায়ে নিসা ২৯, সূরায়ে মায়েদ ৯০, আহকামুল কোরআন জাসসাস ২/৫৮২, তাফসীরে রুহুল মাআনী ৩/২৫০, জামেয়ে তিরমিযী ২/৭৮, মুসলিম শরীফ ২/২, ইসলাম আওর জদীদ মাঈশত ওয়া তিজারাত ৯০)